ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু:
দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু: দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, চেয়ারপার্সন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক-গবেষনা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত

মু. জাকির হোসেন খান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন
নিহার রঞ্জন রায়, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি
মো: নেওয়াজুল মওলা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন
নাহিদ শারমীন, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি

কৃতজ্ঞতা

সম্পাদনায় মূল্যবান সহায়তার জন্য আন্তরিক শাহজাদা এম. আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মেহেদী হাসান- ইন্টার্ন (খন্ডকালীন), জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, টিআইবি ও স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহকারীগণ সহ টিআইবি'র গবেষণা এবং পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন ইউনিট ও ইউনিটের সহকর্মীদের প্রতি, যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চমতলা)
বাড়ি ৫ ,সড়ক ১৬(নতুন) ২৭(পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন:(+৮৮০-২)৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২)৯১২৪৭৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

সারণি, চিত্র ও বক্সের তালিকা ৪

মুখবন্ধ ৫

গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ ও পরিভাষা ৬

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ৭

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ১০

৩. গবেষণার পরিধি ১০

৪. গবেষণা পদ্ধতি ১০

৫. দুর্যোগ মোকাবেলায় আইনি কাঠামো ১১

৬. গবেষণার ফলাফল ১৪

৭. ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ২৩

৮. সুপারিশ ২৬

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ২৮

সংযুক্তি ২৯

সারণি, চিত্র ও বক্সের তালিকা

সারণি ১: গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের ধরন ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ১০

চিত্র ১: ঘূর্ণিঝড় এবং টর্নেডোতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ৭
চিত্র ২: বিভিন্ন সময়ে ঘূর্ণিঝড়ে মৃত মানুষের সংখ্য ৮
চিত্র ৩: ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর গতিপথ ৮
চিত্র ৪: ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৯
চিত্র ৫: ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর সময় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থা ১৭
চিত্র ৬: ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে নাগরিকদের প্রদত্ত সার্বিক স্কোর ১৮
চিত্র ৭: ত্রাণ বরাদ্দে ন্যায্যতার চিত্র ১৯
চিত্র ৮: ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু তে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি এবং বরাদ্দকৃত টিনের পরিমাণ ২০
চিত্র ৯: ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে নাগরিকদের প্রদত্ত সার্বিক স্কোর ২৩

বক্স ১: আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে শুদ্ধাচার চর্চায় ঘাটতি ১৫
বক্স ২: সতর্কবার্তা প্রচারে অবহেলা ১৫

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিগত দু'দশক ধরে কাজ করছে । জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি এ কার্যক্রমের অন্যতম ক্ষেত্র। ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে অর্থ-সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সক্ষমতা ও সমন্বয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি টিআইবি'র কার্যক্রমে প্রাধান্যের ক্ষেত্রসমূহের অন্যতম।

দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের অর্জন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। এই অর্জনকে এগিয়ে নিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে বহুমুখী উৎকর্ষ নিশ্চিত করা ও সুশাসনের মৌলিক উপাদানসমূহকে বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবেলার মূলধারায় টেকসই করার উদ্দেশ্যে সরকারসহ সকল অংশীজনের সাথে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে টিআইবি বড় ধরনের দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কর্মকান্ডে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। ২০১৬ সালের ২১ মে উপকূলীয় ১৫টি জেলায় ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু আঘাত হানে। এই ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসে ২৭ জন মারা যায় এবং বিভিন্ন ধরনের সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ইতিপূর্বে ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭) ও আইলা (২০০৯) মোকাবলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় (২০০৭ এবং ২০১০) সুশাসনগত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি "ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু: দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক এই গবেষণা পরিচালনা করেছে।

এ গবেষণায় ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে সরকারের গৃহীত কার্যক্রমে সুশাসনের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য, দুর্গম এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা প্রচার, আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য, ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরি সাড়াদানে উপকারভোগী নির্বাচন ও ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য এবং ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি অন্যতম। জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো, ঘূর্ণিঝড়ের আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দুর্যোগের ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত না করা, আশ্রয়কেন্দ্রে দুর্গতদের নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার অনুপোযোগিতা, উপকারভোগী নির্বাচন ও ত্রাণ বিতরণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো ও নিরসন ব্যবস্থার ঘাটতি অন্যতম। জনসম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু'র আগে সচেতনতার অংশ হিসেবে নাগরিকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি মহড়ার আয়োজন না করা, আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'র পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ না থাকা এবং উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া ও ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণে জনঅংশগ্রহণের ঘাটতি অন্যতম। এছাড়া ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু পূর্ববর্তী সময়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আশ্রয়কেন্দ্র প্রভাবশালীদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, প্রভাবশালীদের প্রভাবে আশ্রয়কেন্দ্র যথাস্থানে নির্মাণ না করা, নির্মাণে অনিয়ম, ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু পরবর্তী কার্যক্রমে কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ইচ্ছামাফিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাভুক্তিতে ও ত্রাণ বিতরণে ক্ষতিগ্রস্তের প্রয়োজনের তুলনায় রাজনৈতিক সমর্থনকে বেশি গুরুত্ব প্রদান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রাণ আত্মসাৎ অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিলো।

গবেষণাটি পরিচালনায় টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকে নির্দেশনা এবং অনুপ্রাণিত করার জন্য সম্মানিত চেয়ারপার্সন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। টিআইবি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. সুমাইয়া খায়ের এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান সার্বিকভাবে গবেষণাটি তত্ত্বধান এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ গবেষণার পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন মু. জাকির হোসেন খান, নিহার রঞ্জন রায়, মো: নেওয়াজুল মওলা এবং নাহিদ শারমীন। তথ্য সংগ্রহে তাদেরকে সহয়তা করেছেন শিক্ষানবিশ মেহেদি হাসান ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারীগণ। শাহজাদা এম আকরাম গবেষণা প্রতিবেদনটি সম্পাদনায় সহায়তা প্রদান করেছেন। টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ অন্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ গবেষণাটি প্রণয়নে বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও সহায়তা করেছেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, জেলা ত্রাণ ও পুণর্বাসন কর্মকর্তা, জেলা পর্যায়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুত কর্মসূচি'র প্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য, ত্রাণ বিতরণকারী এনজিও'র কর্মী, গণমাধ্যম কর্মী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে গবেষণাটি সম্পাদনে সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

টিআইবি আশা করে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ বাংলাদেশে দুর্যোগ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকের যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ ও পরিভাষা

টিআইবি	**ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ**
সিডিকেএন	**ক্লাইমেট এন্ড ডেভেলপমেন্ট নলেজ নেটওয়ার্ক**
সিপিপি	**ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি**
বিবিএস	**বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো**

১. প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে বিভিন্ন দেশে ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস সহ নানা ধরনের দুর্যোগের ঝুঁকির মাত্রা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এরই প্রেক্ষিতে, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে ৮৩টি দেশ এ সংক্রান্ত আইনগত প্রবিধান প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশেও দুর্যোগের ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বাড়ছে এবং ঝড়,বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় প্রতি বছর প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। বাংলাদেশে বিগত ১৬ বছরে (১৯৯১-২০০৬) মাত্র ৬টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলেও পরবর্তী এক দশকে (২০০৭-২০১৬) ৫টি ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। ২০১৩ সালে প্রকাশিত ক্লাইমেট ভালনারেবল মনিটর অনুসারে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৬ লাখ মানুষ ঝুঁকিতে এবং ১২৫ কোটি ডলারের অতিরিক্ত অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে[১]।

চিত্র ১: ঘূর্ণিঝড় এবং টর্ণেডোতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা (২০০৯-২০১৪)

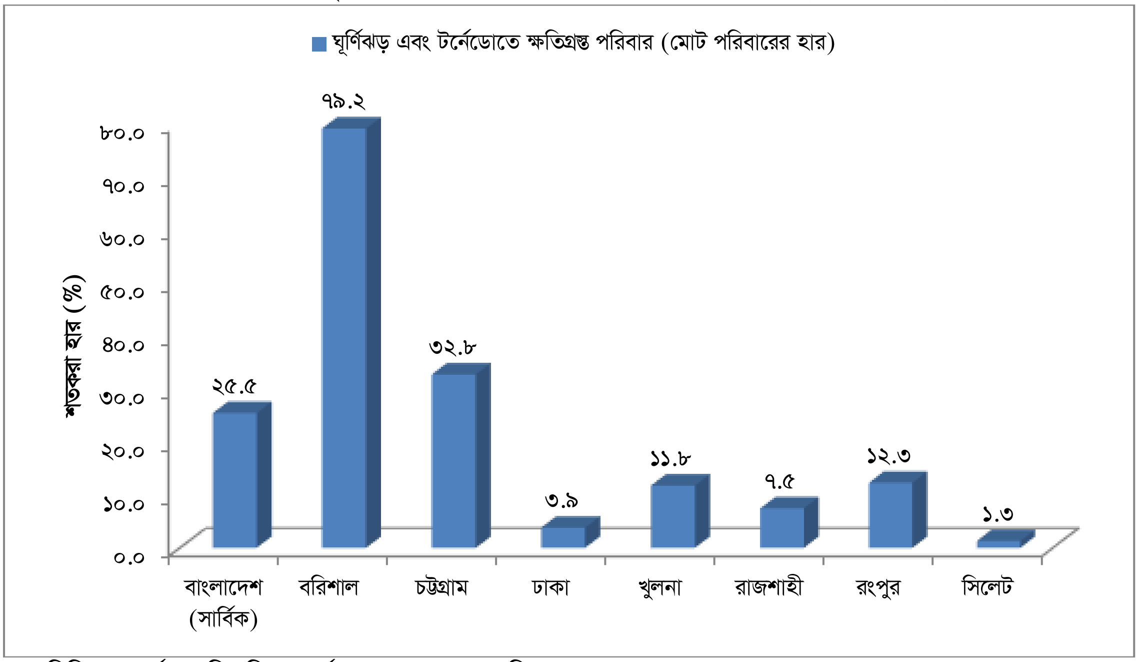

সূত্র: বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত দুর্যোগ সংক্রান্ত খানা জরিপ ২০১৫

বাংলাদেশে বিগত ১৬ বছরে (১৯৯১-২০০৬) মাত্র ৬টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলেও গত এক দশকে (২০০৭-২০১৬) সিডর (২০০৭), আইলা (২০০৯), মহাসেন (২০১৩), কোমেন (২০১৫) ও রোয়ানু (২০১৬) এর মতো ৫টি ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের প্রতিফলন। বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরো'র দুর্যোগ সংক্রান্ত খানা জরিপ ২০১৫ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০০৯-২০১৪ সময়কালে ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডোতে বাংলাদেশের মোট খানার ২৫.৫১% ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (বিবিএস, ২০১৫)। স্বাভাবিকভাবেই, উপকূলীয় অঞ্চলের বরিশাল বিভাগে সার্বিকভাবে ৭৯.২২ শতাংশ পরিবার এবং চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগে যথাক্রমে ৩২.৭৬ শতাংশ এবং ১১.৮ শতাংশ পরিবার ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডোর ন্যায় দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়েছে। তবে দুর্যোগের শিকার পরিবারের মধ্যে দুই এবং তিন বা তার অধিক বার ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা যথাক্রমে ২৭ শতাংশ ও ১৭ শতাংশ[২]। ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে আড়াই লাখ[৩] বা তার চেয়ে বেশি মানুষ নিহত হলেও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বিশেষকরে নিহত হওয়ার মাত্রা ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা সক্ষম হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৬ এর ২১ মে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু'র আঘাতে ২৭ জন মানুষ নিহত হয়[৪]। এই ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছাসে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরগুনা, লক্ষীপুর এবং ভোলায় ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয়, বিশেষকরে জমির ফসল, পালিত গরু, ছাগল এবং অন্যান্য প্রাণী, মৎস্য ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তবে বাংলাদেশ লোকায়িত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে বিশ্বে নজির স্থাপন করেছে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যেগগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ প্রণয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ প্রণয়ন এবং এর আওতায় দুর্যোগ

---

[১]https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bangladesh_tropical_cyclones
২দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিবিএস এর খানা জরিপ, ২০১৫
[৩]https://en.wikipedia.org/wiki/1991_Bangladesh_cyclone, ১১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে সংগৃহীত
[৪]http://www.iied.org/cyclone-roanu-hits-bangladesh-story-loss-damage-avoided হতে ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে সংগৃহীত

ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়ন; সমগ্র দেশের দুর্যোগের ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি এবং দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য জাতীয় কন্টিজেন্সী পরিকল্পনা প্রণয়ন।

চিত্র ২: বিভিন্ন সময়ে ঘূর্ণিঝড়ে মৃত মানুষের সংখ্যা

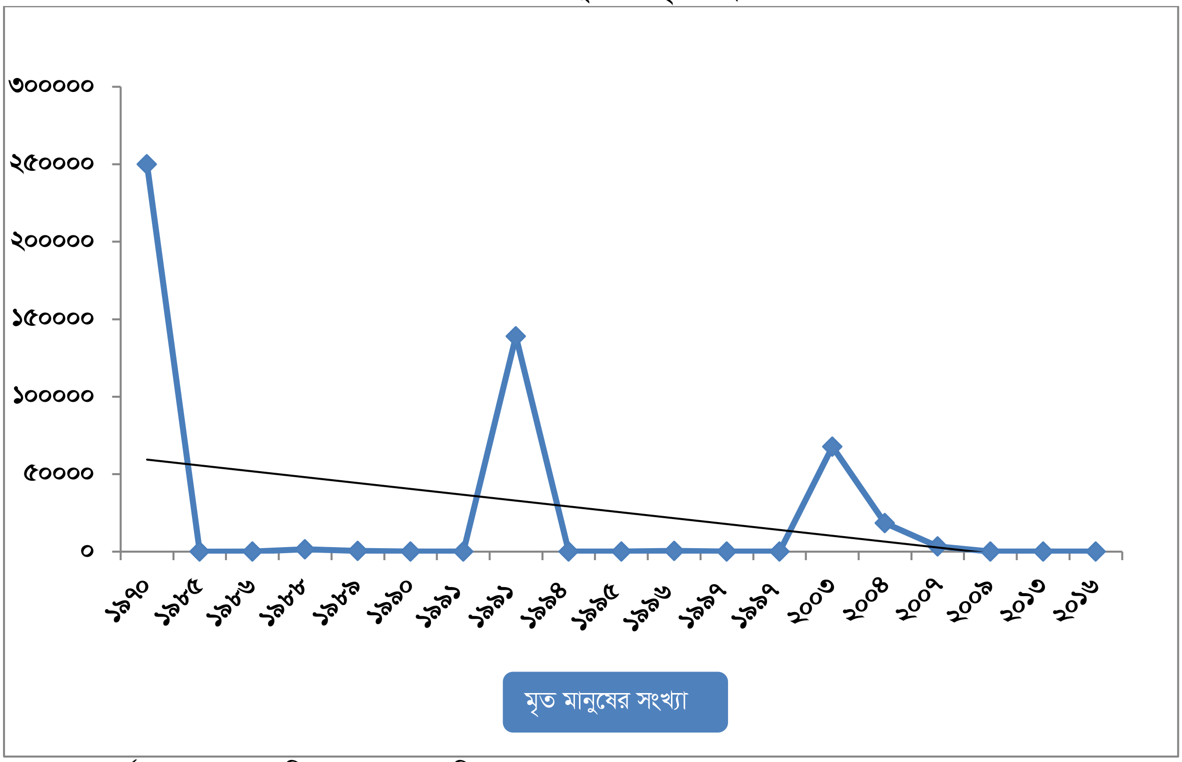

তথ্যসূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯ জানুয়ারি ২০১৭।

বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা মডেল বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত ও অনুসৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে জীবনহানির পরিমাণ কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান যে বিষয়গুলো অবদান রেখেছে সেগুলো হলো,

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ প্রণয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণয়ন এবং এর আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন;
- সমগ্র দেশের দুর্যোগের ঝুঁকি ম্যাপ তৈরি এবং দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য জাতীয় কন্টিজেন্সী পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- কমিউনিটি-ভিত্তিক ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির আওতায় উপকূলীয় বিভিন্ন উপজেলায় ৫৫,২৬০ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ ও নিয়ুক্তি;
- উপকূলীয় ৩৫টি উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সতর্কবাতা প্রচারের জন্য মেগাফোন ও সাইরেন, ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী সময়ে উদ্ধার অভিযান পরিচালনায় ১২টি পিকআপ ভ্যান, ১৬টি নৌযান ও ৬টি মোবাইল অ্যাম্বুলেন্স প্রদান;
- উপকূলীয় বিভিন্ন উপজেলায় ১০০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন এবং ২১৬টি নির্মাণাধীন;
- খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আইলা বিধ্বস্ত জেলাসমূহে ৩,৮৯৪টি দুর্যোগ-সহনীয় গৃহ নির্মাণ;
- দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর জন্য উপকূলীয় এলাকায় সবুজ বেষ্টনী তৈরি।

চিত্র ৩: ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর গতিপথ

২০০৭ সালে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডর-এর পর ২০০৯ এ আইলার পর ২০১৬ এর ২১ মে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটার গতিতে উপকূলীয় ১৫টি জেলায় আঘাত হানে।

এর ফলে মূলত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরগুনা, লক্ষ্মীপুর ও ভোলায় ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয়, বিশেষকরে জমির ফসল, পালিত গরু-ছাগল এবং অন্যান্য প্রাণী, মৎস্য ও অন্যান্য সম্পদ ঘূর্ণিঝড়ের বাতাসে এবং জলোচ্ছ্বাসে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। উল্লেখ্য, দুর্যোগের সময় যাতে পূর্ভাবাস প্রদানকারী এবং ঝুঁকিতে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী সহজে দুর্যোগের সংকেত বুঝতে পারে সেজন্য বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় মালদ্বীপের প্রস্তাবে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর নামকরণ "পাকানো রশি" করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর উপকূলীয় এলাকার ৫ লাখ বাসিন্দাকে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নিয়েছিল।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতি গ্রহণের পরও ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বেশি হওয়ায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী রোয়ানু'র প্রভাবে আর্থিক এবং অন্যান্য সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির হিসাবে সর্বমোট ১,১০,৬৮৪টি পরিবার আংশিকভাবে এবং প্রায় ২৯ হাজার পরিবার পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে আশংকার বিষয় হলো, প্রায় ২৫ হাজার বাড়িঘর সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রায় ৬০ হাজার পরিবারের বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

চিত্র ৪: ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

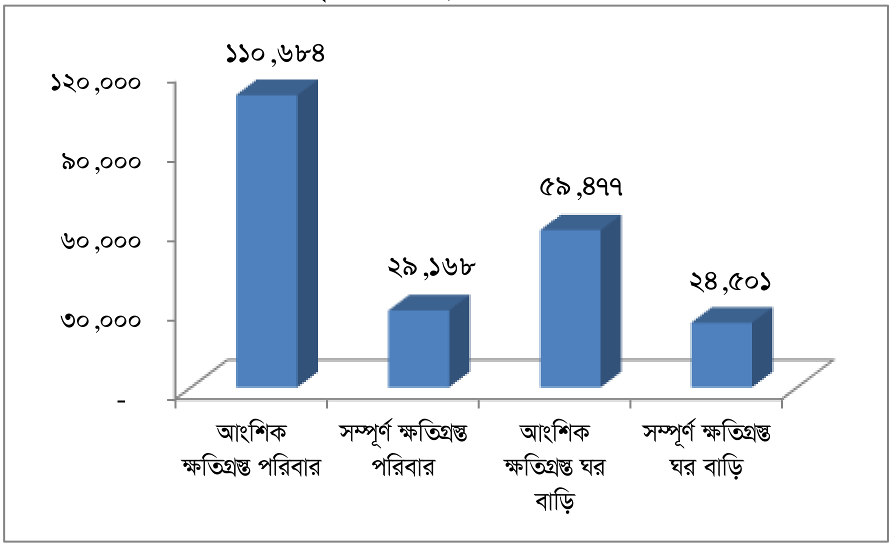

সূত্র: ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে সংগৃহীত

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ৫,৬৮২ মেট্রিক টন চাল এবং এক কোটি আশি লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বাংলাদেশে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ প্রণয়ন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ এর মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি এবং জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত 'সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশান' এ ২০১৫-২০৩০ সময়কালে দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোতে দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন এবং কার্যকর সাড়া প্রদানে দুর্যোগ-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ অনুসারে ঘূর্ণিঝড় পূর্ববর্তী প্রস্তুতি এবং জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা সত্ত্বেও গণমাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ইতিপূর্বে ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭) ও আইলা (২০০৯) মোকাবলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় (২০০৭ এবং ২০১০) সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগ মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের স্বীকৃত অর্জনকে এগিয়ে নিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে বহুমুখী উৎকর্ষ নিশ্চিত করা ও সুশাসনের মৌলিক উপাদানসমূহকে বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবেলার মূলধারায় টেকসই করার উদ্দেশ্যে সরকারসহ সকল অংশীজনের সাথে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে টিআইবি বড় ধরনের দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কর্মকান্ডে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি "ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু: দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক এই গবেষণা পরিচালনা করেছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার উদ্দেশ্য ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও তার কারণ, ফলাফল ও প্রভাব চিহ্নিত করা; এবং গবেষণায় প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশ প্রদান করা।

৩. গবেষণার পরিধি

ঘূর্ণিঝড় বা দুর্যোগ মোকাবেলায় জাতীয় পর্যায় হতে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রধানত কয়েকটি পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গবেষণাটিতে স্থানীয় পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রস্তুতি গ্রহণ এবং ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী দুর্যোগকালীন জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী সময়ে সতর্ক বার্তা প্রেরণ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ব্যবহার উপযোগী করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে স্থানান্তর, প্রয়োজনীয় ত্রাণ এবং অর্থ বরাদ্দ ও মুজদ করা, আহত এবং প্রাণহানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং অন্যান্য সহায়তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে উপকারভোগী নির্বাচন এবং ত্রাণ কার্যক্রমকেও এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী সময়ে ত্রাণ বিতরণ, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ যাচাই এবং পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের চাহিদা নিরূপণকে এ গবেষণার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সুশাসনের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্দেশক থেকে শুধুমাত্র নির্ধারিত চারটি নির্দেশকের (স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ ও শুদ্ধাচার) ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় বিবেচিত সময় ছিল ২০১৬ এর মে হতে জুন পর্যন্ত এবং গবেষণার তথ্য সংগ্রহের মেয়াদকালছিল২০১৬ এর মে মাস হতে ২০১৭ এর জানুয়ারি পর্যন্ত। উল্লেখ্য, **একটি একটি গুণগত গবেষণা বিধায় উপস্থাপিত তথ্য ও গবেষণার ফলাফল সাধারণীকরণ করা যাবে না এবং গবেষণার ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে এ ফলাফল রোয়ানু'র মতো দুর্যোগ মোকাবেলায় বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতিসমূহের একটি দিক-নির্দেশনা প্রদান করে।**

৪. গবেষণা পদ্ধতি

জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি গ্রহণ এবং ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু-পরবর্তী সময়ে পরিচালিত ত্রাণ কার্যক্রমের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের পরিমাণ প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশক থেকে শুধুমাত্র চারটি নির্দেশক স্বচ্ছতা বা তথ্যের উন্মুক্ততা, জবাবদিহিতা, জন অংশগ্রহণ ও শুদ্ধাচারের মাত্রা এবং প্রকৃতি বিবেচনা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর মধ্য হতে নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকাকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য বাছাই করা হয়েছে এবং সেসব এলাকা হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। এ গবেষণায় গুণগত গবেষণার বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষণার খসড়া প্রতিবেদনের ওপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করা হয়। নিচে গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের ধরন ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা নির্ধারণ

এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য জন্যে রোয়ানুর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ১৫টি জেলার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচটি জেলাকে (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষ্মীপুর, ভোলা ও বরগুনা) তথ্য সংগ্রহের জন্য বাছাই করা হয়েছে। জেলাসমূহ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো, জেলাভিত্তিক মৃতের সংখ্যা, ক্ষয়-ক্ষতির শিকার খানা ও বাড়ির সংখ্যা সংখ্যা[৫] এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি। এরপর নির্বাচিত ৫টি জেলার সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত দুইটি করে মোট ১০টি উপজেলা নির্বাচন করে প্রত্যেকটি উপজেলা থেকে চূড়ান্তভাবে একটি করে মোট ১০টি ইউনিয়ন হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্যের ধরন ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বিত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গবেষণার লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উৎস অনুযায়ী তথ্যের ধরন ও তথ্যের উৎস সহ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ১: গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের ধরন ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্যের ধরন	তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	গুণগত	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (৫২ জন)	কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; জেলা প্রশাসক; অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক; জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা; উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা; উপজেলা চেয়ারম্যান; উপজেলা

[৫]দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো'র ওয়েবসাইট হতে "ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু পরবর্তী প্রাথমকি ক্ষয়-ক্ষতির বিতরণ ও পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য নিম্নলিখিত ১৫টি জেলাসমূহে ২২ মে ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং মজুদ ত্রাণ সামগ্রী সংক্রান্ত প্রতিবেদন" ১০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে সংগৃহীত।

তথ্যের ধরন	তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
			প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা; প্রতিনিধি, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি); ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য; ত্রাণ বিতরণকারী এনজিও'র কর্মকর্তা; সাংবাদিক ও স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি
		ফোকাস দলীয় আলোচনা (১৭টি, অংশগ্রহণকারী ১৮০ জন)	ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ
	পরিমাণগত	কমিউনিটি স্কোর কার্ড (১৭টি, অংশগ্রহণকারী ১৮০ জন)	
পরোক্ষ তথ্য	-	পর্যালোচনা	প্রতিবেদন পর্যালোচনা, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা

গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী সতর্কতা গ্রহণ এবংঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বা তথ্যের উন্মুক্ততা, জবাবদিহিতার চর্চা, নাগরিক অংশগ্রহণ, সমন্বয় এবং শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে গুণগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়- মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা। গুণগত তথ্যের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

চেকলিস্টের মাধ্যমে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য, ত্রাণ বিতরণকারী এনজিও কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

দলীয় আলোচনা ও কমিউনিটি স্কোর কার্ড

তথ্যের উন্মুক্ততা, প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে জবাবদিহিতার চর্চা, জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত সংগ্রহে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় আলোচনার আয়োজন করা হয়। দলীয় আলোচনার ক্ষেত্রেও একটি পূর্ব-নির্ধারিত চেকলিস্ট-এর সহায়তা নেওয়া হয়। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি এবং পরবর্তী সময়ে ত্রাণ কার্যক্রম, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মানসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদানের পাশাপাশি অংশগ্রহণমূলক কমিউনিটি স্কোরকার্ড পদ্ধতির মাধ্যমে সম্মিলতিভাবে নির্দিষ্ট বিষয়ে স্কোর (১-৪ এর মধ্যে) প্রদান করে। এক্ষেত্রে লাইকার্ট স্কেল অনুযায়ী 'মোটেও একমত নয় ১', 'একমত নয় ২', 'একমত ৩', এবং 'পুরোপুরি একমত ৪' নির্দেশ করে। উল্লেখ্য, গবেষণার উদ্দেশ্য বিবেচনায় স্কেলের মান ২ হতে ১০ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হলেও এ গবেষণার জন্য 'মোটামুটি একমত' বাদ দিয়ে ৪টি স্কেল ব্যবহার করা হয় যাতে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের সুনির্দিষ্ট মতামত সংগ্রহ করা হয়।

৫. দুর্যোগ মোকাবেলায় আইনি কাঠামো

দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রত্যেক মানুষের সমান সুযোগ এবং সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার বাংলাদেশ সংবিধানে স্বীকৃত। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১) তে বলা হয়েছে 'রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করবে'। যেহেতু দুর্যোগে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী বেশি সম্পদ হারায়, সেহেতু আক্রান্ত জনগোষ্ঠী তাদের জীবন-ধারণের মৌলিক উপকরণ ফিরে পাওয়ার অধিকার রাখে[৬]। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মূলত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এবং দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ অনুসরণ করা হয়। এসব আইন, নীতিমালা এবং আদেশাবলীতে বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় নির্দেশনা ও আদেশাবলী উল্লেখ করা হয়েছে।

[৬] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫

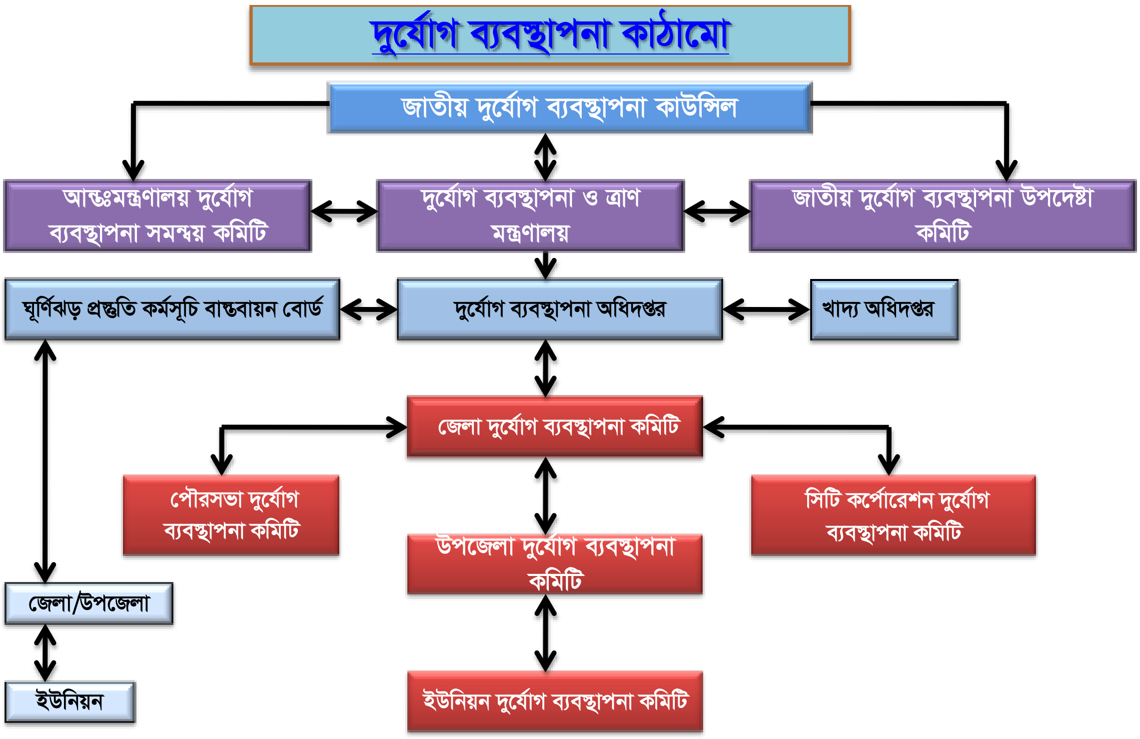

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২

দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতিসহ জনগণের সার্বিক দুর্যোগ লাঘব করা, দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণীত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হলো দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সাড়াদানের নিমিত্তে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যক্রম, যার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এসব পদক্ষেপের মধ্যে আছে, (ক) দুর্যোগের বিপদাপন্নতা, পরিধি, মাত্রা ও সময় নির্ণয়; (খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ সব ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ, সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়ন; (গ) আগাম সতর্কতা, বিপদ বা মহাবিপদ সংকেত প্রদান ও প্রচারের ব্যবস্থা এবং জানমাল নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর; এবং (ঘ) দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ও চাহিদা নির্ধারণ, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের অধীন ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন এবং অত্যাবশ্যকীয় সেবা, পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি হ্রাস পর্যায়ের প্রধান পদক্ষেপসমূহ হলো- (ক) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি নিরূপণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাসের উপায় নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন; (খ) ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকিহ্রাসে বহুবিধ ব্যবহারযোগ্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্র যাওয়ার জন্য গণসচেতণতা তৈরি; (গ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির আওতায় উপকূলীয় এলাকায় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান;(ঘ) উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ, সবুজ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠা, গণদুর্যোগ সচেতনতা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা; (ঙ) ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও কার্যকর সম্প্রচার ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন; (চ) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) আধুনিকায়ন ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা; এবং (ছ) স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় নিয়মিত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি মহড়া আয়োজন করা।

জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে-(ক) ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত পুনঃস্থাপন ও জরুরি তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ; (খ) দুর্গত অঞ্চলে এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে জরুরি ভিত্তিতে পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; (গ) প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ এবং তার

ভিত্তিতে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা; (ঘ) দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন; (ঙ) বিভিন্ন পর্যায়ে ত্রাণ তহবিল ও ত্রাণ ভাণ্ডারের নগদ অর্থ ও সামগ্রী দ্রুত দুর্গত এলাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ; (চ) প্রাথমিক ত্রাণের চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে জাতীয় ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ এবং সুষ্ঠুভাবে তা বিতরণ; এবং (ছ) ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস-পরবর্তী জরুরি পরিস্থিতিতে অনুসন্ধান, উদ্ধার ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

দুর্যোগ বিষয়ক আদেশাবলী ২০১০

দুর্যোগ বিষয়ক আদেশাবলীতে ঝুঁকি হ্রাস পর্যায়ের পদক্ষেপসমূহের মধ্যে আছে-(ক) নিয়মিত দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন; (খ) লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক সামর্থ্য, সামাজিক অবস্থা, পেশা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ; (গ) সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন বা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণে বিপদাপন্নতা হ্রাস; এবং (ঘ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় সরকার, স্বেচ্ছাসেবী ও জনসাধারণকে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম করে তোলা।

সতর্ককালীন পর্যায়ের পদক্ষেপসমূহের মধ্যে আছে- (ক) সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার; (খ) উদ্ধারকারী দলের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ এবং অপসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠিকে অপসারণ; (গ) প্রশিক্ষিত প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী এবং জনসাধারণকে দুর্যোগের পূর্ভাবাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর নিকট প্রচার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ; (ঘ) পূর্ব নির্ধারিত জরুরি আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবগণের সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ; এবং (ঙ) আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটে নির্ধারিত স্থানে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে বিকল্প উৎস ঠিক রাখা।

দুর্যোগ পর্যায় ও দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায় জরুরি সাড়াদানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপসমূহ হল, (ক) দুর্যোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুজবে জনসাধারণ যেন ভিতসন্ত্রস্ত না হয়ে পড়ে সেজন্য যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রেরণ; (খ) প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করে জরুরি উদ্ধার কাজ পরিচালনা; (গ) দুর্যোগকালে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; (ঘ) জনসাধারণের মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ স্থানান্তরে সহযোগিতা; (ঙ) ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কার্যক্রমের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয়; এবং (চ) ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ বিতরণে সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা-২০১১

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে, যেসব ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে নির্মাণকারী ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজেরাই এর ব্যবহারকারী সেসব আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের দায়িত্ব তাদের ওপরই ন্যস্ত। অন্যদিকে যেসব আশ্রয়কেন্দ্রের মালিকানা নির্মাণকারী সংস্থা কর্তৃক নির্মাণের অব্যবহিত পরেই সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হবে সেসব আশ্রয়কেন্দ্রের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের অনুমোদনক্রমে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর ন্যস্ত হবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হতে আশ্রয়কেন্দ্রের মালিকানা-স্বত্ব সরকারের কাছে হস্তান্তরের পর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ আশ্রয়কেন্দ্রের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুকূলে বরাদ্দ করবে[৭]।

সার্বিকভাবে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা তাহলো, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব পদক্ষেপের মধ্যে ছিল (ক) ঝুঁকিপূর্ণ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জরুরি ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয় সভা ডাকা এবং সভায় উপস্থিত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; (খ) রেড ক্রিসেন্টসহ বিভিন্ন সংস্থার স্বেচ্ছাবেসক ও স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি কর্তৃক স্থানীয় জনগণকে মৌখিকভাবে, মোবাইল ফোনে এবং মাইকের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা জানানোর ব্যবস্থা করা; (গ) ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত ৬ নম্বরে পৌঁছানোর সাথে সাথে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষকে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা; (ঘ) উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রস্তুত রাখা; (ঙ) আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য চিড়া, মুড়ি ও গুড়ের মত শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করা; (চ) জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের অন্তর্ভুক্ত সরকারি-বেসরকারি সকল সদস্য ও প্রতিষ্ঠানকে সার্বক্ষণিক তৎপর রাখা এবং এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর ছুটি বাতিল করা; এবং (ছ) জেলা প্রশাসন থেকে উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবেলায় সরকার নির্ধারিত বিভিন্ন নির্দেশনা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।

[৭] ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১ অনুসারে।

৬. গবেষণার ফলাফল

৬.১ ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী জরুরি পদক্ষেপ

৬.১.১ ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু-পূর্ববর্তী কার্যক্রমে ইতিবাচক দিক

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে জরুরি সাড়া প্রদানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর ফলে ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা বিশেষকরে মৃতের সংখ্যা উল্লেখজনকভাবে হ্রাস পায়। সুনির্দিষ্টভাবে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো হলো-

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর-এর ওয়েবসাইটে ঘূর্ণিঝড়ের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ;
- রোয়ানুর আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের ইমেইল-এর মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান;
- স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম না থাকা সত্ত্বেও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগের বার্তা প্রদানে স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্যোগ গ্রহণ;
- জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর থেকে জরুরি ত্রাণ সহায়তা হিসাবে সম্ভাব্য আক্রান্ত জেলাগুলোতে ৫ কোটি টাকার শুকনো খাবার, ৩,১২২ মেট্রিক টন চাল এবং ৮০ লাখ ৫২ হাজার টাকা বরাদ্দ;
- স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক শুকনো খাবার সংগ্রহ এবং স্থানীয়ভাবে তা মজুদ; এবং
- **বেসরকারিভাবে নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ।**

তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও গবেষণায় ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু-পূর্ববর্তী কার্যক্রমে সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে, যা নিচে আলোচনা করা হলো।

৬.১.২ ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু-পূর্ববর্তী কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

- **দুর্যোগের ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা এবং পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি**

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থানা নীতিমালায় উল্লেখ আছে, "দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের আশঙ্কা ও ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত ও তা বিশ্লেষণ করে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার মাধ্যমে সকল পর্যায়ের মানুষের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করা"[৮]। সাধারণত এপ্রিল-মে ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার সম্ভাবনা থাকায় এসব এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের ঝুঁকি মোকাবেলায় অরক্ষিত অবকাঠামো বিশেষকরে পোল্ডার এবং ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ি বাঁধ চিহ্নিত করে নতুন বেড়ি বাঁধ নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ সহ ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো সরকারি এবং বেসরকারিভাবে মেরামত করার কথা। কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় এ ধরনের কোনো ঝুঁকি যাচাই করা হয়নি। ফলে রোয়ানুর আঘাতে যেসব ক্ষয়-ক্ষতি হয় তা নিম্নরূপ-

- ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু'র আগে ১০টি ইউনিয়নে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাঁধ, পোল্ডার, আশ্রয়কেন্দ্র চিহ্নিত করা হয় নি। ঘূর্ণিঝড়ের আগে ১০টি ইউনিয়নের কোনো কোনো এলাকার জনগণকে ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য জানানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিলো। এমনকি ৮টি ইউনিয়নে চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাঁধ, পোল্ডার, আশ্রয়কেন্দ্র সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি ছিলো।

- 'স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বিষয়ে স্থানীয় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় নিয়মিত প্রস্তুতি মহড়ার আয়োজন করার'[৯] বিধান থাকলেও ১০টি উপজেলাতেই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলায় নিয়মিত প্রস্তুতি মহড়ার আয়োজন করা হয়নি।

- মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে, অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্র দীর্ঘমেয়াদি টেকসই পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি করা হয়নি। ফলে নদী-ভাঙন এলাকায় নির্মিত বেশ কয়েকটি আশ্রয়কেন্দ্র নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

- গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, আশির দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যেসব ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে তার একাংশের গুণগত মান সন্তোষজনক নয়। ৬টি ইউনিয়নের কোনো কোনো ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর সময় সে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর ব্যবহার উপযোগিতা ছিলো না। এর ফলে রোয়ানুর সময় বিপদাপন্ন জনগণের আশ্রয় নিতে সমস্যা হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশ্রয়কেন্দ্রের বাইরে ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করতে হয়।

[৮] জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫।

[৯] প্রাগুক্ত।

আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের ক্রয় বিধি অনুসরণ করার কথা থাকলেও স্থানীয়ভাবে তা মানা হয়না। আশ্রয়কেন্দ্র নিম্নমানের সামগ্রী (রড, সিমেন্ট, বালি, দরজা, গ্লাস ইত্যাদি) দিয়ে তৈরি। কিছু আশ্রয়কেন্দ্রের মেঝে ফাটল ধরায় ও জানালা নষ্ট থাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সময় সেখানে অবস্থান করা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। ফলে সহজে এসব আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, যা এ গবেষণায় এবং ২০১৩ সালে পরিচালিত টিআইবি'র জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন সংক্রান্ত প্রতিবেদনেও চিহ্নিত করা হয়েছে[১০]। এসব আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব এবং অনৈতিক সুবিধাভোগী ঠিকাদার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার যোগসাজশ অন্যতম চ্যালেঞ্জ। ই-জিপি'র মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকল্প দরপত্র জমা প্রদান করা হলেও দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে হওয়ায় এখনো যোগসাজশ সম্ভব। ফলে প্রকৃত ঠিকাদাররা সৎভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চাইলেও তারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না এবং প্রাক্কলিত বাজেটের চেয়ে কম বাজেটে কাজ করার ফলে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা নিশ্চিত করতে নিম্নমানের পণ্য ব্যবহার করে, ফলে কাজের মানের ওপর প্রভাব পড়ে। আশ্রয়গ্রহণকারী অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে এসব আশ্রয়কেন্দ্র দুর্যোগকালীন সময়ে থাকার জন্য উপযোগী নয়।

বক্স ১: আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে শুদ্ধাচার চর্চায় ঘাটতি

বিভিন্ন সরকারের সময় নির্মিত অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি। ফলে সহজে এসব আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এসব আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে গড়ে মোট বরাদ্দের ৭০ শতাংশ অর্থ ব্যয় হয়, বাকি অর্থ বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যায়। তাছাড়া এসব আশ্রয়কেন্দ্র যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেও দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।

- মুখ্য তথ্যদাতা

▪ ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে ঘাটতি

আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে আবহাওয়ার বিশেষ বুলেটিন পাওয়ার সাথে সাথে সিপিপি'র প্রধান কার্যালয় থেকে ওয়্যারলেস সেট-এর মাধ্যমে জোনাল ও উপজেলা পর্যায়ে ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনা করে বিভিন্ন নাম্বারের সতর্কবার্তা প্রেরণ করা হয়ে থাকে[১১]। পরবর্তীতে উপজেলা থেকে ওয়্যারলেস সেট এর মাধ্যমে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ চরাঞ্চল ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আবহাওয়ার বিশেষ বার্তা প্রেরণ করা হয়। এ ধরনের আবহাওয়া বার্তা গ্রাম পর্যায়ে সিপিপি'র ইউনিট টিম লিডারের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়। তবে গবেষণায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী,

- রোয়ানু আঘাত হানার পূর্বে সতর্কবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সাথে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সমন্বয়হীনতা ছিলো।
- সতর্ক সংকেত প্রচারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় হালনাগাদ সতর্ক সংকেত প্রচার করেনি। এর ফলে, ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি বেড়ে যায়। দুর্যোগের বার্তা প্রচারের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতের ব্যাপারে বিদ্যমান দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ তে এ বিষয়ে কোনো দিক-নির্দেশনা না থাকাও একটি চ্যালেঞ্জ।
- দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার সতর্ক সংকেত প্রচারের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে'।[১২] কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি ইউনিয়নেই সতর্কবার্তা প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় ওয়ারলেস, মাইক ও যানবাহনের ঘাটতি থাকায় ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে স্থানীয়ভাবে মাইকের মাধ্যমে সতর্ক সংকেত প্রচার করা হয়েছে।
- ঘূর্ণিঝড়ের ২৪ ঘন্টা পূর্বে এ ধরনের প্রচার-প্রচারণার বাধ্যবাধকতা থাকলেও ১০টি ইউনিয়নের দুর্গম এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের আগে যথাযথ সময়ে সতর্কবার্তা পৌঁছানো হয়নি। এমনকি কোনো কোনো ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় এক থেকে দুই ঘন্টা পূর্বে তা করা হয়েছে এবং কিছু দুর্গম এলাকায় কোনো ধরনের সতর্কবার্তা পৌঁছায় নি।

বক্স ২: সতর্কবার্তা প্রচারে অবহেলা

"একটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান চৌকিদারকে পাঠিয়েছিলেন সর্তকবার্তা প্রচারের জন্য।কিন্তু তিনি তা না করে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার কিছু মানুষকে মুখে মুখে বলে গিয়েছেন। কিন্তু কোনো মাইক বা হ্যান্ডমাইক দিয়ে প্রচার না করায় এলাকার অধিকাংশ মানুষ সতর্কবার্তার বিষয়ে জানতে পারেনি।" - দলীয় আলোচনা

[১০] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/max_file/CFG-Assesment_Working_Paper_BANGLA.pdf; ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে সংগৃহীত

[১১] এ ধরনের আবহাওয়া বার্তা গ্রাম পর্যায়ে সিপিপি'র ইউনিট টিম লিডারের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়। সতর্ক সংকেত ১-৩ এর মধ্যে হলো মৌখিকভাবে একে অপরকে জানানো এবং একটি সংকেত পতাকা উত্তোলন, সংকেত ৪-৭ এর মধ্যে হলে মেগাফোন ও মাইকের মাধ্যমে উচ্চস্বরে স্থানীয় জনগনকে অবহিত করা, দুটি সংকেত পতাকা উত্তোলন ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিরবাস্তবায়ন কতৃপক্ষের জরুরি সভা আহ্বান এবং সংকেত ৮-১০ এর মধ্যে হলে মেগাফোন, মাইক, হ্যান্ড সাইরেন, পাবলিক এড্রেস সিস্টেম দ্বারা স্থানীয় জনগনকে অবহিত করা এবং তিনটি সংকেত পতাকা উত্তোলন করা হয়।

[১২] দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০, পৃষ্ঠা-১৮৬।

- ঝুঁকিগ্রস্ত জনগণের সচেতনতায় ঘাটতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।
- ঝুঁকিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠী দুর্যোগের সতর্কবার্তাকে গুরুত্ব না দেওয়ায় ১০টি ইউনিয়নেই সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং দুটি উপজেলায় মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

▪ প্রয়োজনীয় আশ্রয়কেন্দ্রের ঘাটতি

সরকারিভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, উপকূলীয় এলাকায় ৫,০০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের চাহিদার[১৩] বিপরীতে ৩,৭৫১টি নির্মাণ করা হয়েছে। এসব আশ্রয়কেন্দ্রের প্রতিটিতে গড়ে এক হাজার লোক আশ্রয় নিলেও অতিরিক্ত আরও প্রায় ১ কোটি ৪৫ লাখ মানুষ[১৪] ঝুঁকির মধ্যে থাকছে। উল্লেখ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ১০০টি নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে এবং ২১৬টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে[১৫]। এ অবস্থায় অধিকাংশ চরাঞ্চল ও দ্বীপ এলাকাসমূহে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের অপর্যাপ্ততার কারণে শুধুমাত্র পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তি, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীরা সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা আশ্রয়কেন্দ্রের মাঠে, উঁচু গাছে কিংবা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজ বাড়িতে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর সময় গবেষণাভুক্ত পাঁচটি ইউনিয়নে আশ্রয়কেন্দ্রের ধারণক্ষমতার চেয়ে দুই থেকে তিনগুণ বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। গবেষণাভুক্ত তিনটি ইউনিয়নে বসবাসকারীদের একাংশ নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ না করে জেলা ও উপজেলা শহরে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

▪ আশ্রয়কেন্দ্রে অভিগম্যতায় চ্যালেঞ্জ

- কোনো কোনো উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি স্থানীয় কিছু বেসরকারি সংস্থা এক্ষেত্রে তৎপর থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা পর্যাপ্ত ছিল না। গবেষণা এলাকার ১০টির মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ৬টি ইউনিয়নের কোনো কোনো এলাকায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগের ঘাটতি ছিলো। কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগে যথেষ্ট ঘাটতি থাকলেও তুলনামূলকভাবে ভোলায় স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ ছিল। তবে বরগুনায় স্বেচ্ছাসেবী বা বেসরকারি সংস্থাসমূহ ঝুঁকিপূর্ণ মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য এলাকার চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর ছিল।
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১ অনুসারে, 'আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থান অবশ্যই বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি বিশেষত সর্বোচ্চ ১.৫ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে হতে হবে যাতে দুর্যোগকালে জনগণ দ্রুততার সাথে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে পারে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অবশ্যই নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধীসহ সকল জনগোষ্ঠীর ব্যবহার উপযোগী হতে হবে'। বিগত বছরগুলোতে সংঘটিত দুর্যোগে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ না করে প্রভাবশালীদের অনৈতিক প্রভাবে যেসব জায়গায় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে দুর্যোগের সময় এলাকার সাধারণ মানুষের কোন উপকারে আসছে না। ৬টি ইউনিয়নের কোনো কোনো ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছাতে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের প্রায় দুই থেকে তিন কিলোমিটার কাঁচা ও ভাঙ্গা রাস্তা অতিক্রম করতে হয়েছে। দুর্গম চরাঞ্চল ও দ্বীপাঞ্চলের অবস্থানকারী ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী জানায় ঘূর্ণিঝড়ের আগে তাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ব্যবস্থা ছিল না, ফলে এসব এলাকার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়ে। কিছু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের আগেই ৩-৪ ফুট পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা পানির মধ্য দিয়ে হেঁটে আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছায়। এসব এলাকার আশ্রয়প্রার্থীরা প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জিনিষপত্রসহ আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছাতে দুর্ভোগে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ ও বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে পানিতে আটকে পড়াদের উদ্ধারের ব্যবস্থাও করা হয়নি। প্রয়োজনীয় যানবাহন বিশেষকরে নৌযানের ব্যবস্থা না থাকায় আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তি, বৃদ্ধ, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীরা সমস্যায় পড়েছিলো।
- গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, একটি ইউনিয়নে প্রভাবশালীদের অনৈতিক প্রভাবে আশ্রয়কেন্দ্র উপযুক্ত স্থানে নির্মাণ না করায় রোয়ানুর সময় ঝুঁকির মধ্যে থাকা মানুষের উপকারে আসে নি। গবেষণা এলাকায় অবস্থিত উপকূলীয় একটি এলাকার বাসিন্দারা আশ্রয়কেন্দ্রটি সাগর পাড়ে অবস্থিত হওয়ায় জলোচ্ছ্বাসের ভয়ে সেখানে কেউ আশ্রয় গ্রহণ করেনি।

▪ ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর সময় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে অব্যবস্থাপনা

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, উপকূলীয় এলাকায় সরকারিভাবে নির্মিতভাবে অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে প্রাথমিক এবং ক্ষেত্র বিশেষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলে। এসব আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির ওপর ন্যস্ত। একটি আশ্রয়কেন্দ্রে সাধারণত ২৫০-৩০০ জন আশ্রয় নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে থাকে এবং পরিস্থিতির বিবেচনায় সর্বোচ্চ ১,০০০ আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় নিতে পারে। যেসব আশ্রয়কেন্দ্র বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা নির্মাণ করেছে এবং সেখানে তাদের কার্যক্রম

---

[১৩] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে ৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে সংগৃহীত

[১৪] বিস্তারিত দেখুন 'উপকূলের আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই পায় না দেড় কোটি মানুষ', *দৈনিক যুগান্তর*, ২৫ জুলাই ২০১৫।

[১৫] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, জানুয়ারি, ২০১৭।

পরিচালনা করছে সেসব আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিতভাবে হয়। এছাড়া সরকারিভাবে ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রে স্কুলের কার্যক্রম চলছে সেসব আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ তুলনামূলকভাবে ভালো হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তোষজনক নয়। তথ্যদাতারা জানিয়েছেন, এসব আশ্রয়কেন্দ্রেরও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। অন্যদিকে খালি পড়ে থাকা আশ্রয়কেন্দ্রের একাংশ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর সময় এ ধরনের কিছু আশ্রয়কেন্দ্রের তালা সময়মতো না খুলে দেওয়ায় আশ্রয়প্রার্থীদের দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। উল্লেখ্য এ ধরনের আশ্রয়কেন্দ্রের চাবি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের কাছে থাকে। সুনির্দিষ্টভাবে যেসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো -

চিত্র ৫: ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর সময় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থা

- ১০টি ইউনিয়নেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল ও লোকবল নেই।
- ১০টি ইউনিয়নেই শুধু আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত একাংশের রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ব্যবহার অনুপযোগী ছিল। অনেক আশ্রয়কেন্দ্রে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশের কারণে ঝুঁকিতে থাকলেও লোকজন সেখানে যেতে চান না। তথ্যদাতাদের মতে, তুলনামূলকভাবে পুরনো আশ্রয়কেন্দ্রের চেয়ে ২০০৯ এ সংঘটিত আইলার পরে নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর সুযোগ-সুবিধা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভাবে ভালো। কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্র নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ফলে ব্যবহার উপযোগী শৌচাগার এবং খাবার পানির সুবিধা তুলনামূলকভাবে ভালো ব্যবস্থা থাকলেও ৬টি ইউনিয়নের কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে পানীয় জলের ও শুকনো খাবারের ঘাটতি ছিলো। কয়েকটি আশ্রয়কেন্দ্রে খাবার পানির নলকূপ সচল থাকলেও কোনো কোনো ইউনিয়নে নলকূপ অকেজো ছিল এবং বিকল্প হিসেবে সংরক্ষিত বর্ষার পানিও ছিল না। কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে শুধুমাত্র নারী ও শিশুদের জন্য বিস্কুট, চিড়া ও মুড়ি সরবরাহ করা হলেও তার পরিমাণ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। উল্লেখ্য, সরকারিভাবে বরাদ্দ করা হলেও গবেষণা এলাকার কিছু আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানরতদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে সরকারিভাবে শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করা হলেও অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্রে কোনো খাবারের ব্যবস্থা ছিল না।
- একটি ইউনিয়নের ৩টি আশ্রয়কেন্দ্র তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকায় ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের আশ্রয় নিতে পারেনি। কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্র কেউ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করলেও তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। কিছু আশ্রয়কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী বসিন্দারা আশ্রয়কেন্দ্রে তাদের বিভিন্ন জিনিষপত্র যেমন লাকড়ি, গোবর ইত্যাদি রাখার ফলে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার উপযোগী ছিল না।
- ৭টি ইউনিয়নের কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের থাকার জন্য পৃথক ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ছিলো। কক্সবাজার এবং বরগুনা বাদে লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম এবং ভোলায় আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের জন্য পৃথক থাকা এবং পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা ছিলনা। অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র যথাযথ তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দ্রুত ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়ছে।

ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে নাগরিকদের প্রদত্ত স্কোর

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী, ২০১০ অনুসারে ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব প্রস্তুতির আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রধান যেসব কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক করার কথা সেসব বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকরা মতামত প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে 'কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা আগে নাগরিকদের ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা জানানো'র বিষয়ে একমত না হওয়ার পাশাপাশি 'সব জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিতে সরকার যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া'র বিষয়ে একেবারেই একমত না হওয়ার কথা জানিয়েছে নাগরিকরা। অন্যদিকে, 'আশ্রয়কেন্দ্রে রাত্রিকালীন অবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা পর্যাপ্ত থাকা' এবং 'আশ্রয়কেন্দ্রে টয়লেটের সুব্যবস্থা থাকা'র ব্যাপারে একমত হলেও 'আশ্রয়কেন্দ্রে পানি ও খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকা'র ব্যাপারে একমত না হওয়ার কথা জানিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী।

চিত্র ৬: ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে নাগরিকদের প্রদত্ত সার্বিক স্কোর

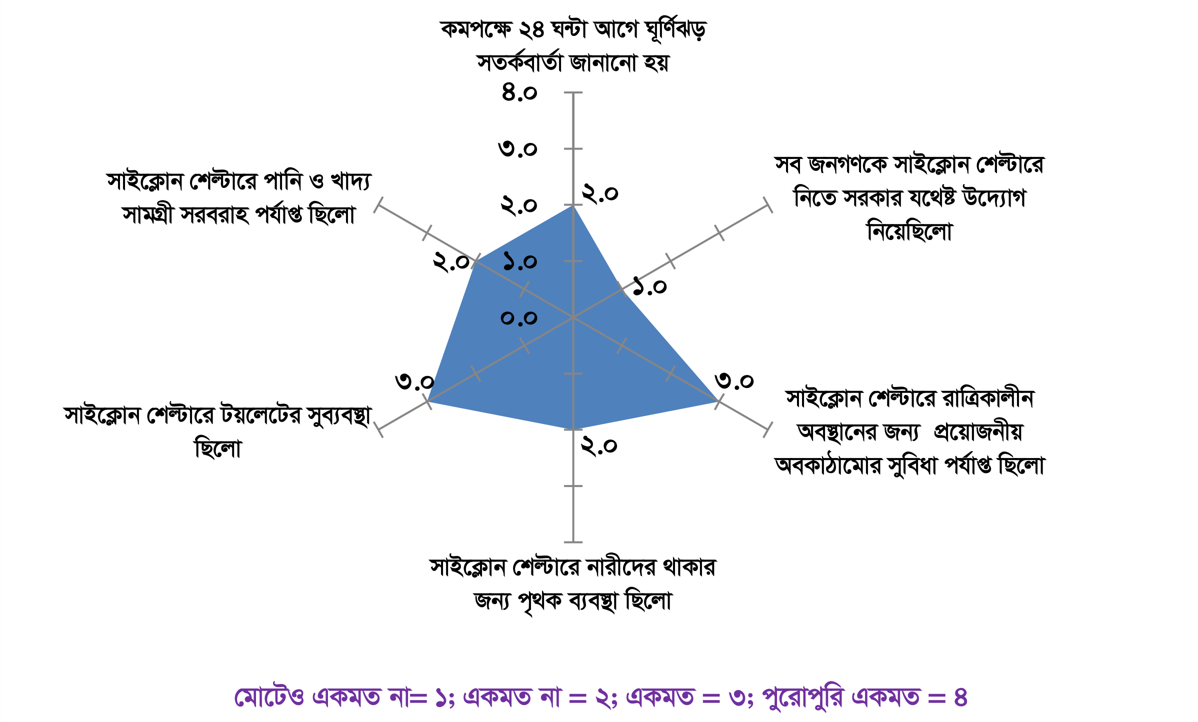

৬.২ ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরি সাড়া দান

৬.২.১ ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী কার্যক্রমে ইতিবাচক উদ্যোগ

সরকারি পদক্ষেপ

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ এর ৩(২)(গ)(২) ও ৩(৩)(গ)(২) অনুসারে, জেলা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজ হচ্ছে 'প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করিয়া জরুরি উদ্ধার কার্য পরিচালনা করা এবং মারাত্মকভাবে আক্রান্ত উপজেলা ও পৌরসভায় উদ্ধার কার্য পরিচালনা করিবার জন্য উদ্ধারকারী দল প্রেরণ করা'। দুর্যোগকালে সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিরা দ্বারা কোনো কোনো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য ১২টি পিকআপ ভ্যান, ১২টি উদ্ধার নৌকা, ৬টি মোবাইল অ্যাম্বুলেন্স, উত্তাল সমুদ্রে অনুসন্ধান উপযোগী ৪টি উদ্ধার নৌকা প্রদানের পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য যানবাহনের ব্যবহার করে উদ্ধার কাজ পরিচালনায় নির্দেশনা প্রদান করেছে। এছাড়াও সরকারিভাবে নির্দিষ্ট 'ডি' ফরমে খানাভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিস্তারিতভাবে নির্ধারণের প্রচেষ্টা ছিলো। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক জরুরি ত্রাণ সহায়তা হিসাবে ৫,৬৮২ মেট্রিক টন চাল ও এক কোটি ৮০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বেসরকারি পদক্ষেপ

ঘূর্ণিঝড়ে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়নে বেসরকারি সংস্থাসমূহ প্রতিটি খানায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছে। এসব সংস্থা সংগৃহীত তথ্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়ন করেছে।

৬.২.২ ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরি সাড়া প্রদানে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

- ত্রাণ বরাদ্দে ন্যায্যতার ঘাটতি এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিবেচনা

ত্রাণ বরাদ্দ এবং বিতরণে ন্যায্যতা নিশ্চিতে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ এর ৩(২)(গ)(৩) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, "ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করা"। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রণীত মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩ অনুসারে, দুর্যোগপ্রবণ এলাকার দরিদ্র, হত দরিদ্র এবং যারা মূলত কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল এমন নাগরিকদের সহায়তার পাশাপাশি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুস্থ, অতি দরিদ্র ব্যক্তি/পরিবারকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত

মাসিক ১০-৩০ কেজি চাল এবং এককালীন পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ৭,৫০০ টাকা বরাদ্দ[১৬] করার কথা। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড়সহ যেকোনো দুর্যোগে মোকাবেলায় জেলা প্রশাসনে আগাম প্রস্তুতি হিসেবে প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী মজুদ করবে এবং রোয়ানুর সময়ও ত্রাণ সামগ্রী মজুদ রাখা হয়েছিল বলে দাবি করেছে। তাৎক্ষনিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে চাহিদা জেনে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ত্রাণ মজুদের ক্ষেত্রে বরাদ্দ সংকট হলে জেলা প্রশাসন নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ দিতে পারে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উপজেলা প্রশাসন তাৎক্ষণিক চাহিদার ভিত্তিতে (এসওএস ফরম) তৃণমূল পর্যায়ে খাদ্যসামগ্রীর অংশ হিসেবে চাল বিতরণ করেছে। পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে 'ডি ফরম' পূরণ করে উপজেলা প্রশাসনে পাঠানো হয় এবং উপজেলা প্রশাসন থেকে জেলা প্রশাসনে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসন থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এছাড়া গবেষণায় আরও দেখা যায় যে, ট্যাগ অফিসারের উপস্থিতিতে সরকারি ত্রাণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার বন্টন করে থাকে। ক্ষতিগ্রস্তদের তিন ধরনের ত্রাণ, যথা-চাল, টিন, এবং টাকা, বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল।

চিত্র ৭: ত্রাণ বরাদ্দে ন্যায্যতার চিত্র

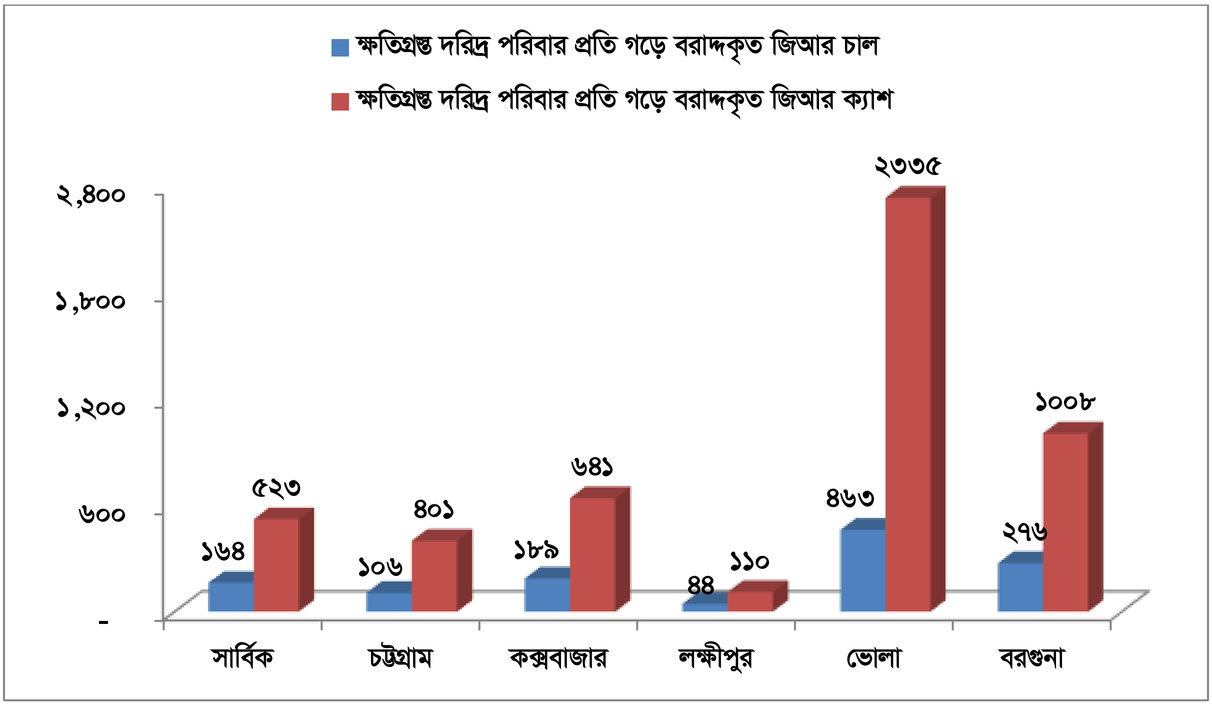

তবে ত্রাণ বরাদ্দে কোনো কোনো ন্যায্যতা নিশ্চিতে ঘাটতি ছিলো। চট্টগ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রতি ৪০১ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ভোলাতে এর ছয় গুণ বেশি বরাদ্দের যৌক্তিক কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। মূখ্য তথ্যদাতা এবং স্থানীয় নাগরিকরা রাজনৈতিক বিবেচনায় ভোলায় বেশি বরাদ্দের অভিযোগ করেন। শুধু তাই নয়, দরিদ্র পরিবারের ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের জন্য নির্মাণ সামগ্রী বরাদ্দে ন্যায্যতা নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও বাস্তবে কোনো কোনো জায়গায় তা নিশ্চিত করা হয়নি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক চট্টগ্রামের প্রায় ২০,০০০ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘর নির্মাণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারকে সহায়তা করার জন্য ১,২০০ বান্ডিল (গড়ে ০.০৬ বান্ডিল[১৭]) ঢেউটিন বরাদ্দের বিপরীতে ভোলাতে ১,৫০০ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘর নির্মাণের জন্য ১,০০০ বান্ডিল (গড়ে ০.৭ বান্ডিল) ঢেউটিন বরাদ্দের যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। এরকম অসম বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা জানিয়েছে মুখ্য তথ্যদাতা। এছাড়া ফোকাস দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর সময় একটি গ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তুলনায় সরকারি ত্রাণ বেশি দেওয়া হলেও পার্শ্ববর্তী আরেকটি গ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তুলনায় সরকারি ত্রাণ স্বল্প পরিমাণ দেওয়া হয়েছে। একটি ইউনিয়নে ঘূর্ণিঝড়ের পর উপকারভোগীদের কেউ কেউ একবার সরকারি বরাদ্দকৃত ৬ কেজি চাল পেয়েছে আবার কেউ কেউ কয়েক দফায় ২০ কেজি চাল পেয়েছে।

[১৬] মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩।

[১৭] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় পরিমাপকৃত দারিদ্র হার বিবেচনা করে গড় বরাদ্দ পরিমাপ করা হয়েছে।

চিত্র ৮: ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুতে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি এবং বরাদ্দকৃত টিনের পরিমাণ

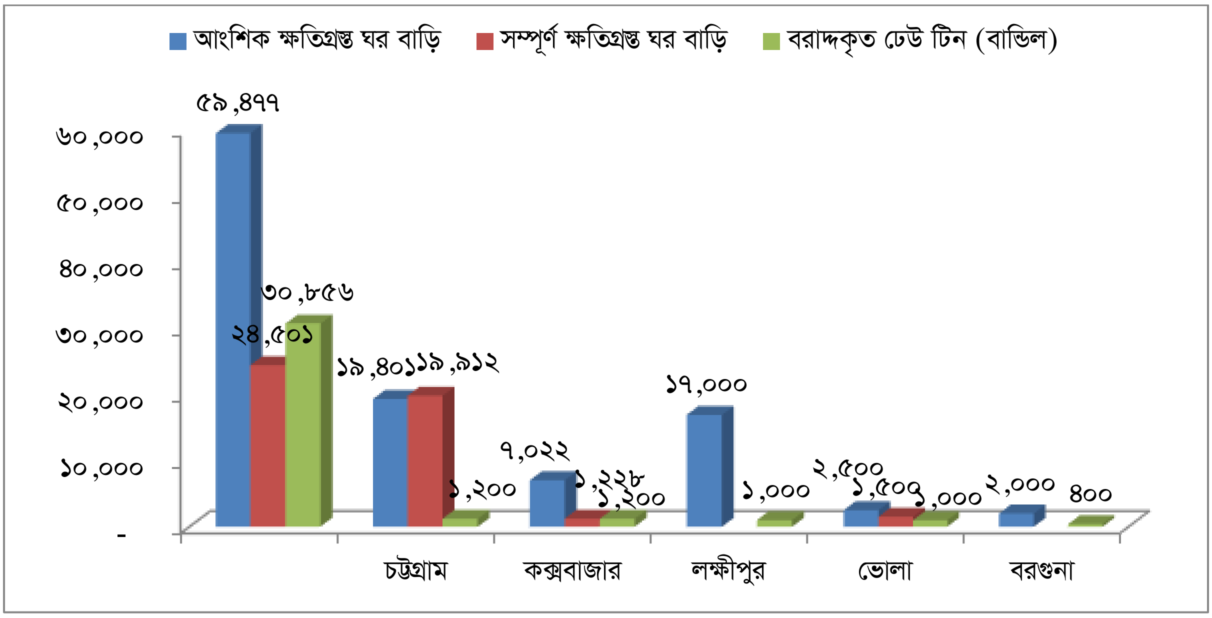

জরুরি ত্রাণের চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে যথার্থতা এবং স্বচ্ছতা চর্চায় ঘাটতি

সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা জেলা এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সদস্য তাই যেকোনো দুর্যোগকবলিত এলাকা পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্ধারকার্য পরিচালনা তাদের দায়িত্ব। তবে গবেষণায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩টি ইউনিয়নের দুর্গম এলাকায় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন না করেই জরুরি ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ করা হয়নি বলে জানা যায়। দশটি ইউনিয়নে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। গবেষণার আওতাভুক্ত এলাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কোনো কোনো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জনপ্রতিনিধিরা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা পরিদর্শন করেছেন। তবে, গবেষণাভুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি ইউনিয়নের দুর্গম এলাকায় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন না করেই জরুরি ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ করা এবং উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপও গ্রহণ না করার কথা জানিয়েছে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী। একজন তথ্যদাতার মতে, "ডিসি সাহেবের পরিদর্শনের কথা শুনতে পাওয়া মাত্রই তারা নিজেদের এক ধরনের নিরাপদ ভাবে।" ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নগদ টাকা এবং ত্রাণ সহায়তা দেয়ার কথা বললেও দলীয় আলোচনায় ক্ষতিগস্ত নাগরিকরা বলেন, চেয়ারম্যান শুধু সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য এসেছিলেন, কোথাও কোনো ত্রাণ বিতরণ করেননি।

ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী সময়ে চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে ত্রাণ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ। এক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়ের পরে সরকারি ত্রাণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যায়ে জন প্রতিনিধিরা এবং বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান থেকে ত্রাণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্তদের পৃথক পৃথক তালিকা তৈরি এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করেছে বলে উল্লেখ করেছেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে প্রতিটি ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট মেম্বার এই তালিকা প্রস্তুত করার কথা জানালেও ১০টি ইউনিয়নেই ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল বলে জানিয়েছে তথ্যদাতারা।

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ এর ৩(২)(ঘ)(১) এ উল্লেখ করা হয়েছে, "অধিদপ্তর বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে, উপজেলা কমিটির মাধ্যমে, দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সত্যতা যাচাই করা এবং সরকারি কর্মকর্তা বা অন্য কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যাক্তিবর্গের মাধ্যমে জরুরি জরিপকার্য সম্পাদনের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ও চাহিদা নির্ধারণ করা হয়"। গবেষণায় জানা যায়, প্রতিটি এলাকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ফরম (ডি ফরম) পূরণকরে পূরণকৃত ফরমটি স্ব-স্ব জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করেছে। জেলা প্রশাসক সকল উপজেলার তথ্য সমন্বিত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ইর্মাজেন্সি অপারেশন সেন্টারের (ইওসি) মধ্যে প্রেরণ এবং প্রাপ্ত তথ্য সমন্বিত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রে প্রেরণ করেছে বরে দাবি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন মৎস্য, কৃষি, পশু সম্পদ, থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্ধারণ করা হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি ইউনিয়নের দুর্গম এলাকায় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন না করেই জরুরি ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ করা হয়। ঘূর্ণিঝড়ের পরে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি খানায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ না করে অনুমানের ভিত্তিতে ১০টি ইউনিয়নের কোনো কোনো এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি, জনপ্রতিনিধিদের মতামত নিয়ে লোকজনের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করা হয়। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা জানায়, "গ্রাম পুলিশ এসে দোকানে বসে কয়েকজন লোকজনের সাথে কথা বলে তালিকা করেছে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করেছে।" অন্যদিকে,বেসরকারি সংস্থাসমূহ ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতির মাত্রা, ধরন যাচাই করে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চাহিদা পাঠায় এবং চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে তাদের এই চাহিদা নির্ধারণের সময় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের সাথে কোনো সমন্বয় ছিলনা বলে মুখ্য তথ্যদাতারা জানিয়েছে। অধিকাংশ বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দলীয় আলোচনা অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিটি খানা থেকে তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রস্তুত করেছে। ফলে এই প্রক্রিয়া সরকারিভাবে তালিকা প্রণয়নের থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি স্বচ্ছ ছিল বলে মনে করেন ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে, এলাকার জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে বেসরকারি সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের তালিকা প্রণয়ন এবং তা বিতরণ করলেও সরকারি প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে দলীয়ভাবে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং এলাকার নেতা কর্মীদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সরকারিভাবে উপকারভোগী নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বাররা তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ডের ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রস্তুত করেছে। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপকারভোগী নির্বাচনে স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পাওয়া যায়। গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রতিটি খানায় গিয়ে পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ না করায় অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা উপকারভোগী হিসেবে জন্য চিহ্নিত হয়নি। এক্ষেত্রে তারা তাদের পরিচিত ও অনুসারীদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে এই তালিকা প্রস্তুত করেছে। ছয়টি ইউনিয়নের কোনো কোনো ওয়ার্ডে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে নির্বাচনে সমর্থন প্রদানকারী/অনুসারীদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, এমনকি ইউপি মেম্বারদের নিকট-আত্মীয়/অনুসারীদের দিয়ে তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। সাতটি ইউনিয়নের কোনো কোনো ওয়ার্ডে তালিকায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত না করে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সমর্থন প্রদানকারী/অনুসারী, যারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নয়, তাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্তি করার অভিযোগ করেছে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী। ক্ষয়-ক্ষতির তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের অংশগ্রহণ ছিল না। যার ফলে পরবর্তীতে ত্রাণ বণ্টনে অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই মনে করে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হওয়ার পরও উপকারভোগী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের আচরণ প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু-পরবর্তী ত্রাণ বিতরণ প্রক্রিয়া, অর্থাৎ কাকে, কী পরিমাণ, কতজন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়েছে, এবং কিসের উপর ভিত্তি করেপরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্তরা জানেনা। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের ভাষায়, "ত্রাণ কিভাবে আসে বা কারা এই ত্রাণ ভোগ করে থাকে এ সম্পর্কে কেউ কিচ্ছু জানে না। সব চেয়ারম্যান, মেম্বার জানে।"

- **ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়হীনতা**

সরকারি প্রশাসন এবং ইউনিয়ন পরিষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ত্রাণ বিতরণ প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং প্রশাসন থেকে নির্ধারিত একজন ট্যাগ অফিসার থাকেন। এক্ষেত্রে সরকারি ত্রাণ বরাদ্দের সময় জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস এবং ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয় থাকার কথা থাকলেও গবেষণায় চিহ্নিত হয় যে, বিতরণ প্রক্রিয়ায় বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে প্রশাসন, স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল। একজন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী, ত্রাণ বিতরণের জন্য তিনি এখন "সম্পূর্ণভাবে ইউনিয়ন পরিষদের ওপর নির্ভরশীল"। ১০টি উপজেলাতেই ত্রাণ বিতরণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা থেকে একাধিকবার ত্রাণ দেওয়া হলেও এই ত্রাণ কার্যক্রমের মধ্যে কোনো সমন্বয় করা হয়নি। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা থেকে ত্রাণ পেয়েছে তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত নয় এমন ব্যক্তিও ত্রাণ পেয়েছে। আবার অন্যদিকে কোনো কোনো এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ত্রাণ পায়নি।

- **ত্রাণ বিতরণে অস্বচ্ছতা এবং শুদ্ধাচার চর্চায় ঘাটতি**

১০টি ইউনিয়নের কোনো কোনো ওয়ার্ডে ত্রাণের পরিমাণ, উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া ও বিতরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপকারভোগীদের জানানো হয়নি। ফোকাস দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, একজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য তার ওয়ার্ডে ৬০ কেজি চাল বরাদ্দ দিয়েছেন তার অনুগত ও ভোটের সময় অবদান রাখা তিন পরিবারকে। আবার ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও যে গ্রামে বা ওয়ার্ড থেকে কম ভোট এসেছে সেখানে জনপ্রতিনিধি কর্তৃক বরাদ্দ দেওয়া হয় না বলে দাবি করেন এলাকাবাসী। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ত্রাণ বিতরণে স্বজনপ্রীতি রয়েছে। একজন তথ্যদাতার

মতে,"মেম্বার মুখ দেখে ত্রাণ বিতরণ করেন"। রোয়ানুর ত্রাণ বিতরণে ক্ষমতার অপব্যবহার বা স্বজনপ্রীতির কয়েকটি অভিযোগ নিচে প্রদান করা হলো।

- সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র বা দুঃস্থ পরিবার প্রতি গড়ে সর্বমোট ১৬৪ কেজি চাল ও ৫২৩ টাকা বরাদ্দ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করা হয়নি।
- পাঁচটি ইউনিয়নের কোনো কোনো ওয়ার্ডে রাজনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় ত্রাণ বিতরণ; ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যরা যে গ্রামে বা ওয়ার্ডে কম ভোট পেয়েছেন সেখানে ত্রাণ বরাদ্দ করা হয়নি। উপকারভোগী নির্বাচনে রাজনৈতিক চাপের কথা স্বীকার করে একজন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা বলেন, "উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব সব সময়ই কাজ করে এবং প্রভাবশালীরা চায় তাদের পছন্দের লোকদের মাঝেই সরকারিভাবে ত্রাণ বিতরণ করার জন্য। সেক্ষেত্রে কিছু ইউনিয়নের চেয়ারম্যানও সেভাবে তালিকা প্রস্তুত করেন। জেলা প্রশাসক মহোদয়কে এই সমস্যার জানালে তিনি সরকারিভাবে শতকরা ৫৫ ভাগ ও রাজনৈতিক বিবেচনায় ৪৫ ভাগ উপকারভোগী নির্বাচন করতে পরামর্শ প্রদান করেন।"
- পাঁচটি ইউনিয়নে ত্রাণের চাল বিতরণের সময় মাপে কম দেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, পরিবার প্রতি ২০ কেজি করে দেবার কথা থাকলেও তাদেরকে সঠিক মাপে চাল দেওয়া হয়নি। তাদেরকে যখন চাল দেওয়া হয় তখন কোনো বাটখারা/দাঁড়িপাল্লা বা অন্য কোনো ওজন মাপার যন্ত্র দিয়ে পরিমাপ করে বিতরণ করা হয়নি। একটি বালতিতে করে অনুমানের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। বাসায় এসে তারা পরিমাপ করে দেখেছেন বাস্তবে গড়ে পরিবার প্রতি মাত্র ১৩-১৫ কেজি চাল দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দলীয় আলোচনায় জানা যায়, ঘূর্ণিঝড়ের পরে বিভিন্ন এনজিও থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য ইউপি মেম্বার সাহায্য করেন এবং ত্রাণ পাওয়ার পর সেই তালিকার লোকদের কাছ থেকে ত্রাণ অর্ধেক নিয়ে যান। অন্যদিকে কোন কোন এলাকায় ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর ত্রাণ বণ্টনের সাথে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ত্রাণ আত্মসাতের অভিযোগ[১৮] পাওয়া যায়।
- ৪টি ইউনিয়নের কোনো কোনো গ্রামে ত্রাণ বিতরণে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবর্তে চেয়ারম্যান ও মেম্বারের নিকট-আত্মীয়/অনুসারীদের প্রাধান্য দেয়া হয়।
- আটটি ইউনিয়নে সরকারিভাবে ঢেউটিন বিতরণ দেখানো হলেও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়নি।
- কিছু কিছু এনজিও ত্রাণ বিতরণে স্থানীয়ভাবে স্বচ্ছতা, যেমন, বরাদ্দকারী দাতা সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ত্রাণ হিসেবে কি কি জিনিষ, কি পরিমাণে পাবে তা উপকারভোগীদের জানানো, বজায় রাখার চেষ্টা করলেও কি পরিমাণ ত্রাণ, কাদেরকে বিতরণ করা হয়েছে সে সংক্রান্ত তথ্য কোনো কোনো উপজেলায় স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করা হয়নি। স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে নাগরিকরা অভিযোগ করে যে, তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাঠপর্যায়ের কর্মীরা প্রত্যেক উপকারভোগীকে ৪০০০ টাকা প্রদানের বিপরীতে তাদের কাছ থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা আদায় করেছে।

▪ ত্রাণ বরাদ্দ এবং বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা

মুখ্য তথ্যদাতা হিসাবে উত্তর প্রদানের সময় প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট এলাকার চেয়ারম্যান, তথ্য কর্মকর্তা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করতে পারে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী, তথ্য কর্মকর্তা এবং প্রকল্প কর্মকর্তা যদি অভিযোগ না নিতে চান তাহলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে সরাসরি অভিযোগ করার সুযোগ রয়েছে। তবে মুখ্য তথ্যদাতা হিসাবে একাধিক জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন যে, অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একজন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার মতে, "শতভাগ মানুষকে ত্রাণ দিলেও এই অভিযোগ থাকবেই যে অনেকে ঠিকমতো ত্রাণ পায় নি। তবে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা বেশি কিন্তু বরাদ্দ কম। তাই কেউ ত্রাণ না পেলে অভিযোগ করে।" গবেষণায় দেখা যায়, ১০টি ইউনিয়নেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কার্যকর ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও নিরসন ব্যবস্থা অনুপস্থিত ছিল।

▪ ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রম সম্পর্কে নাগরিকদের প্রদত্ত সার্বিক স্কোর

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ অনুসারে ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী পর্যায়ে স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক যেসব কার্যক্রম করার কথা সেসব বিষয়ে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকরা মতামত প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে ত্রাণ সংক্রান্ত তথ্য একেবারেই জনসমক্ষে প্রকাশ করার ব্যাপারে মোটেও একমত না হওয়ার কথা জানিয়েছেনতারা। অন্যদিকে স্বজনপ্রীতিহীন ত্রাণ বিতরণ, ক্ষতিগ্রস্তদের সবাই ত্রাণ পাওয়া, ত্রাণ বরাদ্দ এবং বিতরণে ইউপি চেয়ারম্যান এবং মেম্বারদের যথাযথ ভূমিকার পালনের ব্যাপারে একমত না হওয়ার কথা জানিয়েছেন। ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী সময়ে কার্যক্রম সম্পর্কে নাগরিকদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে অভিযোগ প্রদানের ব্যবস্থা থাকার ব্যাপারে একমত না হওয়ার কথা জানিয়েছে নাগরিকরা।

---

[১৮] দৈনিক প্রথম আলো "কালমেঘা ইউনিয়ন পরিষদ: চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ১৩০ মণ চাল আত্মসাতের অভিযোগ" শিরোনামে খবর প্রকাশ করে (২০ অক্টোবর ২০১৬)। আবার "রোয়ানু'র চাল আত্মসাত করলেন চেয়ারম্যান" শিরোনামে অনলাইন পত্রিকা নিউজ২৪ঘণ্টা ডট কম এ খবর প্রকাশিত হয়।

চিত্র ৯: ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে নাগরিকদের প্রদত্ত সার্বিক স্কোর

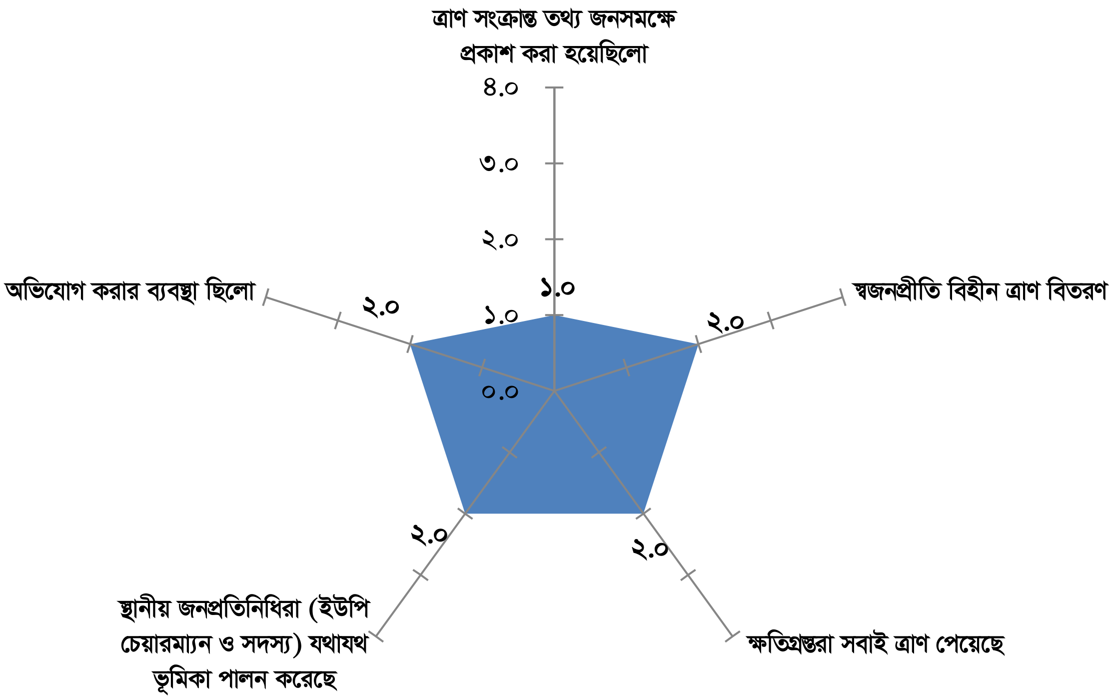

৭. ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

স্বচ্ছতা বা তথ্যের উন্মুক্ততা: ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত 'সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশান'-এর ২৭(ক)(৩) অনুচ্ছেদে দুর্যোগের ঝুঁকি সংক্রান্ত স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট কৌশল এবং উদ্যোগ বৃদ্ধির ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করার পাশাপাশি বালাদেশ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী[১৯], সকল কর্তৃপক্ষ তার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সব তথ্য নাগরিকদের কাছে সহজলভ্য করবে এবং তার প্রকাশ ও প্রচার করবে; কোন তথ্য গোপন বা তার সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করতে পারবে না। সার্বিকভাবে ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী প্রস্তুতির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি, দুর্গম এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা প্রচারে ঘাটতি এবং কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য না থাকা অন্যতম। অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরি সাড়াদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল উপকারভোগী নির্বাচন ও ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য, ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের না জানানো, ইত্যাদি।

জবাবদিহিতা: দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ এর মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী এবং পূর্ববর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতীয়, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ এর ৩(২)(ঘ)(৫) অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা হয়েছে, "ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের অধীনে প্রাপ্ত দ্রব্য সামগ্রীর বন্টন তদারকি করা এবং হিসাব সংরক্ষণকর: উহা সরকার ও ক্ষেত্রমত, ত্রাণদাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ করা"। সার্বিকভাবে, ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী প্রস্তুতির ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দুর্যোগের ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত না করা, ঘূর্ণিঝড় শুরুর আগে আশ্রয়কেন্দ্রে দুর্গতদের সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগের ঘাটতি এবং আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত একাংশ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ব্যবহার অনুপোযোগী থাকা অন্যতম। অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী জরুরি সাড়াদানে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে উপকারভোগী নির্বাচন ও ত্রাণ বিতরণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো ও নিরসন ব্যবস্থার ঘাটতি অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল।

[১৯] অনুচ্ছেদ ৬(১) এবং ৬(২)(১), ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে সংগৃহীত

অংশগ্রহণ: ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত 'সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশান'এ ১৯(ঘ) অনুচ্ছেদে দুর্যোগ মোকাবেলায় সমাজের সব নাগরিকের সক্ষমতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক, পক্ষপাতহীন অংশগ্রহণ এবং অংশীদারিত্বের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু-পূর্ববর্তী প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নাগরিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান যে চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো, স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতার অংশ হিসেবে ঘূর্ণিঝড়ের আগে নিয়মিত প্রস্তুতি মহড়ার আয়োজন না করা এবং আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি'র পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ না থাকা। এর পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী কার্যক্রমে কোনো কোনো এলাকায় উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া ও ক্ষয়-ক্ষতি নির্ধারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ না থাকা অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

শুদ্ধাচার চর্চা: যেকোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শুদ্ধাচার চর্চা'র সাথে দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস সরাসরি সম্পৃক্ত। ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু পূর্ববর্তী প্রস্তুতির ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চায় প্রধান যে চ্যালেঞ্জগুলো এ গবেষণায় চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো, কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্র প্রভাবশালীদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং প্রভাবশালীদের অনৈতিক প্রভাবে কোনো কোনো আশ্রয়কেন্দ্র ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় নির্মাণ না করা। এর পাশাপাশি, ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু পরবর্তী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোনো কোনো ইউনিয়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ইচ্ছামাফিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাভুক্তি এবং ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম ও দুর্নীতি, ত্রাণ বিতরণে ক্ষতিগ্রস্তের প্রয়োজনের তুলনায় রাজনৈতিক সমর্থনকে বেশি গুরুত্ব প্রদান অন্যতম চ্যালেঞ্জ ছিল।

৭.১ সুশাসনের ঘাটতির কারণ

সাবির্কভাবে সুশাসনের উপরোক্ত চ্যালেঞ্জগুলোর কারণ হিসাবে যেসব বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো-

- **সতর্ক সংকেত প্রচারে সমন্বয়হীনতা ও সর্তক সংকেত প্রচারে তারতম্য:** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এবং দুর্যোগ বিষয়ক আদেশাবলী-২০১০ এ জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সতর্ক সংকেত প্রচারে আবহাওয়া বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর মধ্যে কিভাবে সমন্বয় হবে; ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া যথাযথভাবে সতর্ক সংকেত প্রচার করবে যাতে মানুষ বিভ্রান্ত না হয় তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়নি। এমনকি সতর্কতা সংকেত প্রচারে কেউ ভুল বার্তা প্রদান করলে জবাবদিহিতার আওতায় আনার কোনো বিধান বর্তমানে দুর্যোগ সংক্রান্ত কোনো আইনে নেই।
- **ত্রাণ সংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্ত করতে কার্যকর জবাবদিহিতা না থাকা:** তথ্য অধিকার আইন অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণ সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয়ভাবে প্রচারে বাধ্যবাধকতা থাকলেও সে বিষয়ে সাধারণ নাগরিকরা অবহিত নয়। এ বিষয়ে কার্যকর জবাবদিহিতা ব্যবস্থা না থাকায় সংশ্লিষ্ট অংশীজন আইন যথাযথ মেনে চলার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায়নি।
- **আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগানে ঘাটতি:** ২০১১ সালে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত নীতিমালার বিষয়ে জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের একাংশ সম্যকভাবে অবহিত নয়। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা-২০১১ অনুসারে, যেসব ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে নির্মাণকারী ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজেরাই এর ব্যবহারকারী সেসব আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত হলেও প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান না থাকায় আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিতভাবে করতে সক্ষম হয়নি।
- **জবাবদিহিতা ও তদারিকরি ঘাটতি:** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে জড়িত অংশীজনকে কার্যকর জবাবদিহিতার আওতায় আনতে কোনো ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা কোনো আইনেই নিশ্চিত করা হয়নি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণে ন্যায্যতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত না করে রাজনৈতিক বিবেচনায় উপকারভোগী নির্বাচন এবং বরাদ্দ প্রদান বন্ধে কি ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে বিষয়ে কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। ত্রাণ বিতরণে জড়িত কর্মকর্তা বা জনপ্রতিনিধি কার কাছে জবাবদিহি করবে, জনগণের কাছে জবাবদিহি করার কোনো প্রক্রিয়া আছে কিনা, থাকলে সেটি কতটুকু কার্যকর, কার্যকর না হলে কেন নয়, ইত্যাদি স্পষ্ট নয়। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ অনুসারে স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করার কথা থাকলেও বাস্তবে রোয়ানু পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে নিষ্ক্রিয় ছিল।
- **আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, উপকারভোগী নির্বাচন, ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণে রাজনৈতিক প্রভাব:** উপকারভোগীর তালিকা ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ, আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ, ত্রাণ বরাদ্দ এবং বিতরণের ক্ষেত্রে যথাযথ তদারকির ঘাটতি এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের অংশগ্রহণ না থাকায় এসব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।
- **প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত কার্যকর অভিযোগ দায়ের ও নিরসন ব্যবস্থার ঘাটতি:** প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ কর্তৃক ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের এবং তা নিরসনের কার্যকর ব্যবস্থা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা এবং বিধির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়নি।

৭.২ সুশাসনের ঘাটতির ফলাফল

সুশাসনের ঘাটতির কারণে ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব এবং ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী কার্যক্রমে যেসব নেতিবাচক ফলাফল চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

- **দুর্গম এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত না পৌঁছানো:** কার্যকর সমন্বয় এবং জবাবদিহিতার ঘাটতির কারণে দুর্গম এলাকায় যথাসময়ে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত পৌঁছাইনি। এমনকি আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রদত্ত সতর্কবার্তায় অস্পষ্টতার কারণে স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘূর্ণিঝড় আঘাতের সময় বিকাল ৫টা বা তার পরবর্তী সময় ধরে প্রস্তুতি নিলেও সকাল ১১টা হতেই ঘূর্ণিঝড় উপকূলে আঘাত হানতে শুরু করে। ফলে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতির অভাবে কোথাও কোথাও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয়। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সর্তকসংকেত প্রচারে সতর্কতা মেনে না চলার অভিযোগ করেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। যেমন, আবহাওয়া অধিদপ্তর ১০ নম্বর সতর্ক সংকেত প্রচার করলেও কোনো কোনো টিভি চ্যানেল চলমান ৯ নম্বর সতর্কবার্তা প্রচার করতে থাকে, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে।
- **কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থানে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ না করা:** ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের স্থান নির্ধারণে রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে বেশ কিছু জায়গায় নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদের আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়েছে। এছাড়াও আশ্রয়কেন্দ্র দূরে হওয়ার কারণে ঝুঁকিতে থাকলেও জনগণ আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে অনীহা প্রকাশ করে।
- **কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের উপযোগী না থাকা:** আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে দুর্নীতি এবং সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেশ কয়েকটি ইউনিয়নে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার উপযোগী ছিল না। দুর্গত মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জরাজীর্ণ আশ্রয়কেন্দ্রে, এমনকি আশ্রয়কেন্দ্রের বাইরে অবস্থান করতে হয়।
- **ত্রাণ সংক্রান্ত তথ্যের উন্মুক্ততা না থাকা:** তথ্য অধিকার আইন যথাযথভাবে না মেনে চলার কারণে বরাদ্দকৃত ত্রাণ এবং বিতরণের পরিমাণ সম্পর্কে স্থানীয় নাগরিকরা অবহিত হতে পারেনি। এর বাইরেও ত্রাণ বিতরণে ন্যায্যতা নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও নাগরিকরা আগে থেকে অবহিত হতে পারেনি।
- **কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, উপকারভোগী নির্বাচনে ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি: কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, উপকারভোগী নির্বাচনে ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতির ফলে ক্ষয়-ক্ষতির ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তরা ত্রাণ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়।**
- **কোনো কোনো ক্ষেত্রে ত্রাণ বরাদ্দ এবং বিতরণে ন্যায্যতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত না করা:** আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, উপকারভোগী নির্বাচন, ক্ষয়-ক্ষতির ত্রুটিপূর্ণ তালিকা তৈরি, ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণে রাজনৈতিক/ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। দলীয় এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দলীয়ভাবে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ ইউপি নির্বাচনে নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং মেম্বর নির্বাচনে সমর্থন প্রদান করেনি এ অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের প্রয়োজন অনুসারে ত্রাণ প্রদান না করে বঞ্চিত করেছে। এমনকি ত্রাণ বিতরণে কালক্ষেপণ হয়েছে।

৭.৩ সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব

- **ঘূর্ণিঝড়জনিত ক্ষয়-ক্ষতি বৃদ্ধির ঝুঁকি:** ঘূর্ণিঝড়-পূর্ব এবং পরবর্তী পর্যায়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জন-অংশগ্রহণ এবং শুদ্ধাচার চর্চায় ঘাটতির কারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের উদাহরণযোগ্য অর্জনের ধারাবাহিকতা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। এর প্রভাবে ভবিষ্যতে উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত জনগণের ঘূর্ণিঝড়জনিত ক্ষয়-ক্ষতি বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়বে। এর ফলে উপকূলীয় এলাকায় উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি পাবে।
- **উপকূলীয় এলাকায় উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি:** সুশাসনের ঘাটতির ফলে উপকূলীয় এলাকায় উপদ্রুত জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি পাবে। ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আগে এবং পরে সুশাসন নিশ্চিতে দূর্বলতার কারণে ঝুঁকিগ্রস্ত জনগণের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া ইতিমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য, কোনো কোনো এলাকায় বাড়িঘর সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং উপার্জনের কোনো সুযোগ না থাকায় উপকূলীয় এলাকার মানুষের বিপদাপন্নতা বাড়বে। এতে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং আইলার পর বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের যথাযথ পুনর্বাসনের অভাবে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ঘটনা ঘটেছে।

সার্বিকভাবে, ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তবে এটা আরও কমানো সম্ভব হতো যদি ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু মোকাবেলায় বিদ্যমান প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো উৎরানো সম্ভব হতো। সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহের বিষয়ে আগাম সমীক্ষা ও যথাযথ পূর্ব-প্রস্তুতিতে ঘাটতি, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার (যেমন বেড়িবাঁধ, রাস্তা, আশ্রয়কেন্দ্র) নিশ্চিত না করা, ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে সতর্কবার্তা প্রচারে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহ ও সংবাদমাধ্যমের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন না থাকা অন্যতম। শুধু তাই নয়, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগোষ্ঠীর ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তাকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজস্ব বিবেচনার ওপর নির্ভরতা ও সচেতনতার ঘাটতি, আশ্রয়কেন্দ্র উপযুক্ত স্থানে নির্মাণ না করা এবং রক্ষণাবেক্ষণে ঘাটতি, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে রাজনৈতিক প্রভাব, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, আশ্রয়কেন্দ্রে সুপেয় পানি ও শুকনো খাবারের ব্যবস্থায় ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়। এর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রণয়নে সমন্বয়ের ঘাটতি, রাজনৈতিক বিবেচনা, ত্রাণ বরাদ্দ ও

বিতরণে শুদ্ধাচার চর্চায় ঘাটতি এবং উপকারভোগী নির্বাচন এবং ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও নিরসনের কার্যকর ব্যবস্থা না থাকাও প্রধান চ্যালেঞ্জ।

৮. সুপারিশ

(ক) ঘূর্ণিঝড়-পূর্ববর্তী পদক্ষেপ সংক্রান্ত

সুপারিশ	অংশীজন
১. ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা মোকাবেলা সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অবহিত করতে হবে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
২. সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্গম এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত প্রচারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থা নিশ্চিতের পাশাপাশি কমিউনিটি রেডিও এবং মোবাইল ফোনের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৩. সঠিক সতর্কবার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সাথে আবহাওয়া অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ইলেকট্রনিক সহ সকল গণমাধ্যমে হালনাগাদ সতর্ক সংকেত প্রচারে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; আবহাওয়া অধিদপ্তর
৪. উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার ক্ষেত্রে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি তিন মাস পর পর প্রশিক্ষণ ও মহড়ার আয়োজন করতে হবে	জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৫. ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমন্বয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৬. উপকূলীয় এলাকার আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষন ও সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দ এবং কর্মী নিয়োগ করতে হবে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর
৭. ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় উপযুক্ত স্থানে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে কমিউনিটিভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন করতে হবে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮. দুর্গম এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়গ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার এবং সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে	জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৯. ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ, অরক্ষিত পোল্ডার চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে	পানি উন্নয়ন বোর্ড, জেলা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

(খ) ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী পদক্ষেপ সংক্রান্ত

সুপারিশ	অংশীজন
১০.সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ক্ষয়-ক্ষতির চাহিদা নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরির জন্য বিশেষ ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; এনজিও বিষয়ক ব্যুরো; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১১.দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উদ্যোগে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি বেসরকারি ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে	উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১২.দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উদ্যোগে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে উপকারভোগী নির্বাচন এবং ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ও নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; তথ্য অধিদপ্তর; জেলা, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১৩.সরকারি-বেসরকারি ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য উপকারভোগীদের জানানোর জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে গণশুনানীর আয়োজন করতে হবে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; দুর্নীতি দমন কমিশন; তথ্য অধিদপ্তর; জেলা, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

১৪.দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ঘূর্ণিঝড় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিভিন্ন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থার পাশাপাশি উদাহরণযোগ্য অবদানের জন্য ইতিবাচক প্রণোদনা দিতে হবে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; দুর্নীতি দমন কমিশন

(গ) সার্বিক

১৫.'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০' অনুসারে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে এবং পরবর্তীতে ঝুঁকি কমানো ও দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের প্রতি যেসব নির্দেশনা আছে তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে	**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর; এনজিও বিষয়ক ব্যুরো; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি**

....

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

ক্লাইমেট ভালনারেবল মনিটর, ২০১৩, এর ২য় সংস্করণ, সিডিকেএন প্রকাশিত পৃ.৩২০ হতে সংগৃহীত

খান, মজহ; খোদা, মই (২০১০) *'বাংলাদেশের আইলা উপদ্রুত উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ: ব্যস্থাপনা ও পুনর্নির্মাণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা'* ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ বিষয়ক জরিপ-২০১৫, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু এ ক্ষয়-ক্ষতি ও ত্রাণ বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রতিবেদন, ৩১ মে ২০০১৬

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩

Akram, M.S.; Mahmud, T.; Iftekharuzzaman, 2007, *`Integrity in Humanitarian Assistance: Issues and Benchmarks'* Transparency International Bangladesh.

সংযুক্তি

সংযুক্তি ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫টি ক্ষতিগ্রস্ত জেলা

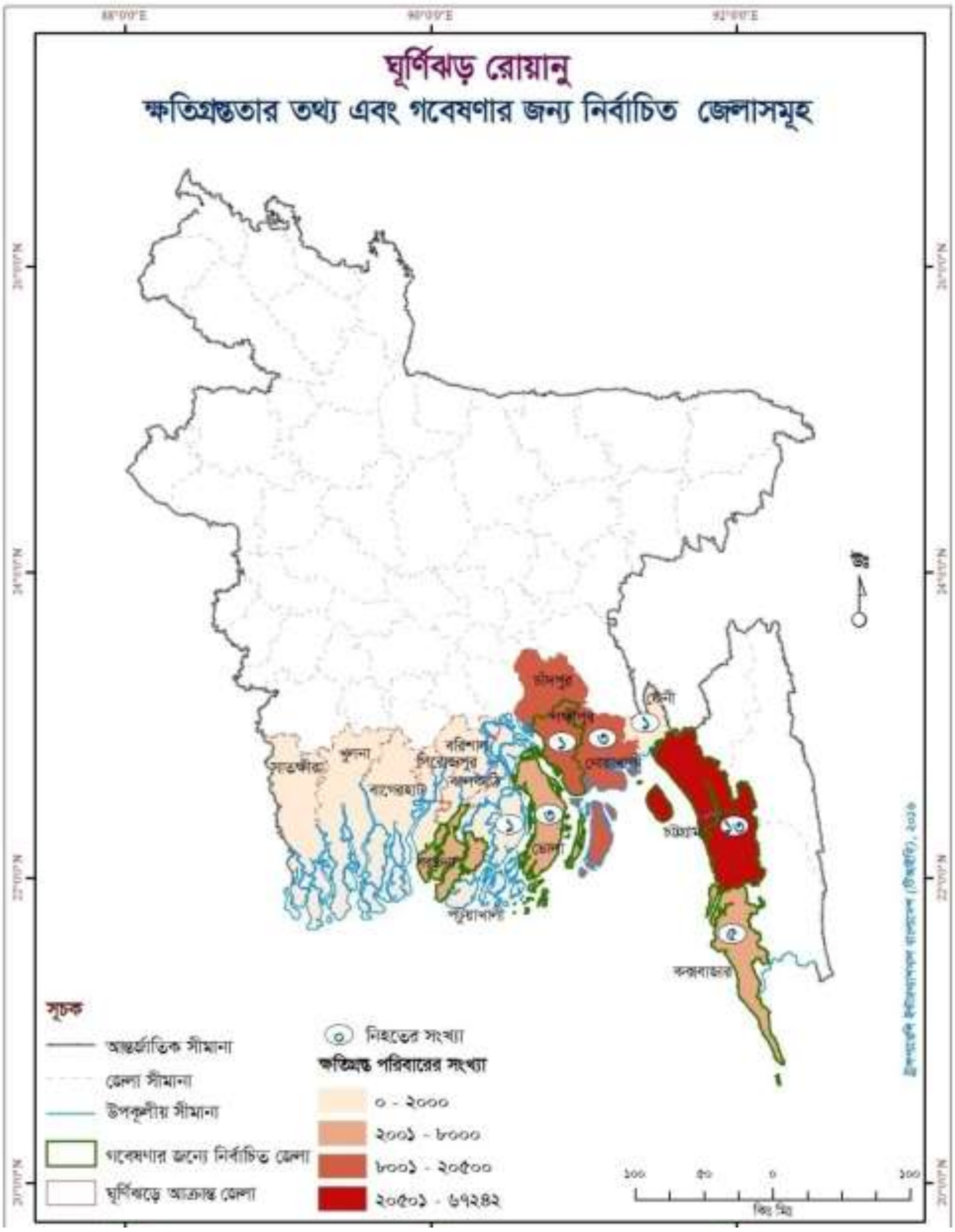

সংযুক্তি ২: ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ

জেলার নাম	আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ঘর বাড়ি	সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ঘর বাড়ি	বরাদ্দকৃত ত্রাণ (জিআর চাল) (মেট্রিক টন)	বরাদ্দকৃত ত্রাণ-জিআর ক্যাশ (মিলিয়ন টাকা)
সার্বিক	১১০,৬৮৪	২৯,১৬৮	৫৯,৪৭৭	২৪,৫০১	৫৬৮২	১৮,১৪২,৫০০
চট্টগ্রাম	৪৯,৩৩০	১৭,৯১২	১৯,৪০১	১৯,৯১২	৮১৯	৩,১০২,০০০
কক্সবাজার	৬,২৩০	১,৭১৫	৭,০২২	১,২২৮	৪৯০	১,৬৬৫,০০০
লক্ষীপুর	১৬,০০০		১৭,০০০		২২০	৫৪৭,০০০
ভোলা	২,৫০০	১,৫০০	২,৫০০	১,৫০০	৬১৫	৩,১০১,০০০
বরগুনা	৪,৯৬০		২,০০০		২৬০	৯৫০,০০০